আহুতি

বীরেন্দ্রনাথ সিংহ

সেলিং এজেন্ট :

বিশ্বনাথ পাবলিশিং হাউস

৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১২ ।

প্রকাশক :
শ্রীগোপাল চন্দ্র খাঁ
আরামবাগ পাব্‌লিসার
৫৭।২, কেশব সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

মুদ্রাকর :
শ্রীবলদেব রায়
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭।২ কেশব সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

প্রচ্ছদপট-শিল্পী :
বিরাজ সেনগুপ্ত

ব্লক-নির্মাতা :
ব্লক ষ্টুডিও
৩০৫।এ, আপার চিৎপুর রোড
কলিকাতা।

বাইণ্ডার :
ইষ্টেণ্ড ট্রেডার্স
২০ কেশব সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

তিন টাকা আট আনা।

উৎসর্গ

পূজ্যপাদ

পিতৃদেবের শ্রীচরণে—

উপন্যাসখানি লেখা হয়ে পড়ে ছিল অনেককাল। যখন লেখা হয়, ছাপবার কথা মনেও হয়নি। সাহিত্য-সেবায় আমার সহযোগী বন্ধুদের পীড়াপীড়িতেই অবশেষে ছাপাখানায় পাঠিয়েছিলাম। অনভিজ্ঞ কাঁচা হাতের লেখায় যেটুকু দোষ-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক তাও কুঁড়েমির জন্য সবক্ষেত্রে সংশোধন করা হয়নি। কাজেই ভুল-ত্রুটির দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টা বৃথা। এজন্য পাঠকের প্রশ্রয় চাইনে। তাঁদের অসঙ্কোচ স্পষ্টভাষণ ও দ্বিধাহীন সমালোচনাই আমার কাম্য।

নিউ কমলা প্রেসের কৃষ্ণবাবু মুদ্রণের দায়িত্ব না নিলে এ বই এত শীগ্গীর বেরোত কিনা সন্দেহ। আরও নানাভাবে যাঁদের কাছ থেকে অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছি তাঁদের কারও ঋণই সহজে পরিশোধ হবার নয়। ছাপার অক্ষরে মামুলি ধন্যবাদ ও শুকনো কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁদের ছোট করতে চাইনে।

মহালয়া, ১৩৫৪
৪, রামধন মিত্র লেন
কলিকাতা—৪

লেখক

আহুতি

কলেজ হোস্টেলে বিখ্যাত শিল্পপতি বিপত্নীক স্যার মৃগাঙ্ক সান্যালের একমাত্র কন্যা মনীষার রুম-মেট রমা লাহিড়ী। ক্রোরপতি মৃগাঙ্ক সান্যালের মেয়ে মনীষার খাতির সকলের কাছে—কলেজের গাভার্নিং বডি, প্রিন্সিপাল মিস্ মালবিকা দাস ও হোস্টেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিসেস মাতঙ্গিনী হাজরা। শান্ত-স্বভাব, দরিদ্র ও মেধাবী বলিয়া রমাও কলেজ-কর্তৃপক্ষ ও অধ্যাপিকাগণের স্নেহের পাত্রী। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া রমা "ক্ষীরোদবাসিনী উম্যানস্ কলেজে"র গৌরব অনেকখানি বৃদ্ধি করিয়াছে।

রমা ও মনীষার প্রথম পরিচয় একটা তুচ্ছ ঘটনা লইয়া, কিন্তু সেই হইতে এই দুইটি হৃদয় পরস্পরের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করিয়াছে এবং বিধাতাও ইহাদের ভাগ্যকে গাঁথিয়া দিয়াছেন একই সূত্রে। কলেজ লাইব্রেরীতে রমা ও মনীষা গিয়াছিল দুইজনে একই বই চাহিতে। গোল বাঁধিল বইটা কাহাকে দেওয়া হইবে তাহা লইয়া, কেননা, লাইব্রেরীতে ও বইয়ের একখানা মাত্র কপিই ছিল। লাইব্রেরীয়ান আরতি

মিত্রের একটা মন্তব্যে অপমানিত বোধ করায় মনীষার জেদ আরও বাড়িয়া গেল—

'ওটা ত অনার্সের বই মনীষা। তোমাদের পাসকোর্সে ওখানা না পড়লেও চলে ; রমা অনার্স দিচ্ছে, বইটা রমাই আগে পড়ুক ; তুমি বরং পরে নিও।'

কিন্তু, কলেজের বিল্ডিং নির্ম্মাণ ও লাইব্রেরী গঠনে যে মৃগাঙ্ক সান্যালের দান লাখের অঙ্ক ছাড়াইয়া যায় তাঁহার মেয়ের দাবী উপেক্ষা করিবার সাহস কাহারও নাই। দাসত্বের রজ্জু একবার গলায় পরিলে নিজের বিবেক ও স্বাধীন বিচারবুদ্ধিকে যে বিসর্জ্জন দিতে হয়, চাকরি জীবনে মালতি মিত্রের এই অভিজ্ঞতা নূতন নয়। সহকারী লাইব্রেরীয়ানের অর্থপূর্ণ ইসারায় তাহার চৈতন্য হইল। বইটা মনীষাকেই দিতে হইল। সহপাঠিনীদের সপ্রশংস দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া মনীষা বিজয় গৌরবে দৃপ্ত ভঙ্গিমায় চলিয়া গেল।

সেদিন কলেজের ছুটির পর মনীষা হোস্টেলে ফিরিতেছিল। দেখিল, অদূরে রমাও হোস্টেলের দিকে যাইতেছে। বিশাল বিস্তৃত কলেজ কম্পাউণ্ডের এক প্রান্তে কলেজ বিল্ডিং, অপর প্রান্তে হোস্টেল। কলেজ বিল্ডিং হইতে হোস্টেল পর্য্যন্ত প্রশস্ত লাল সুরকির রাস্তা। দুই পার্শ্বে ঝাউ ও দেবদারু গাছগুলি সারিবদ্ধভাবে প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান—তাহাদের ফাঁকে ফাঁকে মোসুমী ফুলের বিচিত্র সমারোহ।

মনীষা ক্ষিপ্রপদে কিছুদূর আগাইয়া গিয়া ডাকিল, "রমা! ও রমা!"

ডাক শুনিয়া রমা পিছন ফিরিয়া মনীষাকে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইল। মনীষা কাছে আসিতে রমা শান্ত অনুচ্চস্বরে কহিল,—"আমাকে ডাকছেন?"

"হুঁ" বলিয়া মনীষা চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল কলেজের পরিচিত আর কোন মেয়ে আসিতেছে কিনা। লাইব্রেরীর সেই বইখানা রমার হাতে গুঁজিয়া দিয়া কহিল,—"বইটা আগে তোমার-ই পড়া উচিত। তোমার হয়ে গেলে আমায় দিও।"

সংক্ষেপে এই দুইটি কথা বলিয়া রমাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ না দিয়া মনীষা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া গেল। সহসা মনের এই দুর্বলতাটুকু প্রকাশ হইয়া পড়াতে সে যেন নিজের কাছেই লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। রমাও ভাবিয়া পাইল না বড়লোকের যে আদুরে মেয়েটি কাহাকেও পরোয়া করে না, কথায় কথায় প্রিন্সিপালের সহিত তর্ক করে—নিজের জেদ বজায় রাখিবার জন্য ন্যায়-অন্যায় বিচার করে না, হঠাৎ তাহার এই ভাবান্তর হইল কেন। মনীষার দৃঢ় চরিত্রের মধ্যে যে কোমলতাটুকু লুকাইয়া ছিল এই ছোট্ট ঘটনায় তাহারই পরিচয় পাইয়া রমা মুগ্ধ হইল।

তাহার পর হইতে রমা ও মনীষার এই প্রথম পরিচয় ক্রমে নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছে। রমা স্বভাবতই শান্ত ও স্বল্পভাষিণী—পড়াশুনা ও অবসর সময়ে আত্মচিন্তাতেই মগ্ন থাকে। কলেজ কিংবা হোস্টেলে সহপাঠিনীদের চটুল আমোদ-প্রমোদ ও রহস্যালাপে সে কখনই যোগ দিত না। ইহা লইয়া তাহাকে সর্বদাই মেয়েদের বিদ্রুপপূর্ণ মন্তব্যের সম্মুখীন হইতে

হইত। কিন্তু, মনীষার সহিত পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইবার পর মনীষাই তাহাকে সারাক্ষণ আগলাইয়া থাকে। মনীষার প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের স্নেহচ্ছায়ায় রমা একটি শান্তিময় আশ্রয় খুঁজিয়া পাইয়াছে। মনীষাই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বলিয়া রমাকে তাহার কক্ষে লইয়া আসিয়াছে। এই কয়দিনে রমাকে প্রশ্ন করিয়া করিয়া মনীষা রমার দুঃখময় জীবনের সমস্ত ঘটনাই জানিয়া লইয়াছে।

দুই বছরের শিশু রমাকে কোলে করিয়া মনোরমা বিধবা হয়। স্বামী বিরাজমোহন সওদাগরি অফিসে সামান্য চাকরি করিয়া কিছুমাত্র সঞ্চয় রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। জীবন-বীমার হাজারটি টাকা সম্বল করিয়া মনোরমার বৈধব্য জীবন আরম্ভ হয়। দেবর হরমোহনের চেষ্টায় জমি-জমা হইতে যে সামান্য আয় হইত, তাহাতে সংকুলান হইত না। অবসর সময়ে সেলাই-কোঁড়াই করিয়া মনোরমা নিজেও কিছু রোজগার করিত, বাড়িতে শাক-সবজি লাগাইয়াও কিছু সাশ্রয় করিত।

গ্রামের স্কুল হইতে মেট্রিক পাস করিবার পরে সংসারের কথা ভাবিয়া রমা বলিয়াছিল সে চাকরি করিবে। কিন্তু মনোরমাই তাহাকে জোর করিয়া কলেজে ভর্তি করিয়া দিয়াছে। রমার বিবাহের বয়স হইয়াছে—তাহার কলেজে পড়া লইয়া কুৎসিত আলোচনা মনোরমা নিজের কানেই অনেকদিন শুনিয়াছে। বাহিরে যখন আলোচনা উদ্দাম হইয়া উঠিত, ঘরে ঢুকিয়া রমাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে মনোরমা বলিত,—"তুইতো আমার মেয়ে

নস্ রমু—তুই হ'লি আমার ছেলে। তোকে আমি শীগগীর বিয়ে দেব না।"

রমার পড়ার খরচ অবশ্য মনোরমাকে দিতে হয় না। জলপানি ও বৃত্তির টাকা হইতেই তাহার শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। রমা যেবার প্রথম কলেজে ভর্ত্তি হয় সে বৎসরই মনোরমা টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী ছিল। অনেকদিন ভুগিয়া মনোরমা রোগমুক্ত হইল বটে কিন্তু তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল—পূর্ব্বের কর্ম্মশক্তি সে আর ফিরিয়া পাইল না। বাঙ্গালী হিন্দু পরিবারে উদয়াস্ত পরিশ্রম করিতে না পারিলে বিধবার অবস্থা যাহা হয় মনোরমার বেলাতেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। দেবরের গলগ্রহ হইয়া একবেলা আহারের জন্য এখন মনোরমাকে নাকের জলে চোখের জলে এক করিতে হয়। অধিকন্তু, হরমোহন ইদানীং মনোরমাকে বাস্তুভিটা ছাড়িয়া যাইবার জন্যও নানাভাবে চাপ দিতেছে।

একটি অসহায় ও দুঃস্থ পরিবারের করুণ কাহিনী শুনিতে শুনিতে ধনীর দুলালী মনীষার চোখ ছলছল করিয়া উঠিত। আজন্ম ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে পালিত হইলেও মনীষার মন এই দুঃখী পরিবারটির প্রতি সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিত। এমন কতদিন গিয়াছে হোস্টেলের অন্যান্য মেয়েরা যখন হাস্য-পরিহাস ও রঙ্গ-কৌতুকে মশগুল হইয়া থাকিত এই দুইটি সখী তখন চোখের জলে পরস্পরের বস্ত্রাঞ্চল সিক্ত করিয়া ফেলিত।

সেদিন বিকালে রমা একা ঘরে দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া ফরাসী ইতিহাসের একখানি পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে তন্ময় হইয়া

বসিয়াছিল। মনীষা সান্ধ্য মজলিসে বাহির হইয়াছে, হোস্টেল প্রায় শূন্য। এমন সময় হোস্টেলের ঝি আসিয়া টেবিলের উপরে একখানি মনিঅর্ডারের রসিদ রাখিয়া গেল। রমা ইঙ্গিতে মনীষার টেবিলটা দেখাইয়া দিয়া বইয়ের মধ্য হইতে মাথা না তুলিয়াই কহিল, "রেখে দে ওখানে।"

কিন্তু, ঝি যখন বলিল, 'তোমারগো রমাদি—তুমি যে টাকা পাঠিয়েছিলে, এ তারই রসিদ', তখন রমার বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না।

তিরিশ টাকার রসিদটা হাতে লইয়া দেখিল তাহাতে আঁকা-বাঁকা বাংলা অক্ষরে মনোরমার স্বাক্ষর রহিয়াছে। রমার আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, মনীষাই তাহার বেনামীতে মনোরমাকে টাকা পাঠাইয়াছিল। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া রমা মনীষার অগোছাল বিছানাটার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া সেদিন বড় কান্নাই কাঁদিল। মনীষার এই অযাচিত অপরিমিত দয়ার ঋণ কি সে জীবনে শোধ করিতে পারিবে!

॥ দুই ॥

থিয়েটার রোডে মার্বেল পাথরের প্রাসাদোপম বিশাল অট্টালিকা। সশস্ত্র প্রহরীরক্ষিত সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া ঘাসের বিস্তীর্ণ শ্যামল গালিচার উপর দিয়া হাঁটিয়া যাও। দুই পার্শ্বে ডালিয়া ও ক্রিসেন্থিমামের নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখিয়া চক্ষু জুড়াইবে—পৃথিবীর নানা দেশ হইতে সংগৃহীত বিচিত্রবর্ণের গোলাপের সৌগন্ধে চিত্ত আমোদিত হইবে। সম্মুখেই দেখিবে একটি প্রশস্ত হলঘর। হলঘরের মধ্যস্থলে একটি ডিম্বাকার বিরাট শ্বেতপাথরের টেবিলের চারিদিক ঘিরিয়া স্প্রিংয়ের ঘূর্ণমান বিশ-পঁচিশখানি চেয়ার—প্রত্যেকটির সম্মুখে টেবিলের উপরে সযত্নরক্ষিত এথেনীয় শিল্প-মণ্ডিত আইভরির ফুলদানিতে গুচ্ছ গুচ্ছ বিলাতী ফুল। নিয়ন লাইটের স্নিগ্ধ আলোকে রাত্রিকালেও সমস্ত হলঘরটা যেন দিবসের সূর্য্যালোকে হাসিতেছে।

হলঘরের পূর্বপার্শ্বে একটি লাইব্রেরী, পশ্চিমপার্শ্বে একটি বিরাট মিউজিয়াম। লাইব্রেরীতে পৃথিবীর সমস্ত উন্নত দেশের শিল্প-বাণিজ্যিক অগ্রগতি ও বিভিন্ন দেশের সরকারী শিল্পনীতি ও উন্নয়ন-পরিকল্পনা বিষয়ক মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো বহুবিধ মূল্যবান পুস্তক স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। মিউজিয়ামে নানাদেশের শিল্প-সমৃদ্ধির আধুনিকতম নিদর্শনগুলি বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে সুবিন্যস্ত রহিয়াছে। দক্ষিণ দিকের কাচের

প্রকাণ্ড দরজাটার নিকটে দাঁড়াইবামাত্র দরজাটি আপনিই ঈষৎ উন্মুক্ত হইয়া যাইবে—নিঃশব্দে ঢুকিয়া পড়; সম্মুখে দেখিবে একটি প্রকাণ্ড ত্রিতল অট্টালিকা। দরজার নিকটেই যে লিফ্‌ট্‌ রহিয়াছে, তাহাতে চড়িয়া সর্বনিম্ন বোতামটি টিপিলে তোমাকে দ্বিতলে নামাইয়া দিবে। বাঁদিকের সুসজ্জিত ঘরখানিতে গালিচাস্তীর্ণ মেঝের উপর ভেলভেটের আরাম-কেদারায় বসিয়া এক পলিতকেশ বৃদ্ধ কাশ্মীরীশালে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া সরকারী রিপোর্টের উপর ঝুঁকিয়া রহিয়াছেন। ইনিই সমগ্র দেশের শিল্প-বাণিজ্য পরিচালনার বেসরকারী প্রতিষ্ঠান "Industrial Expansion Board"-এর চেয়ারম্যান, ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য শিল্পপতি স্যার মৃগাঙ্ক সানিয়াল।

সান্ধ্যভ্রমণ হইতে ফিরিয়া এই সময়টাতে শিল্পনায়ক কাহারও সহিত বড় একটা দেখা-সাক্ষাৎ করেন না—একান্তে বসিয়া তথ্যানুসন্ধান ও পরিকল্পনা রচনায় নিবিষ্ট থাকেন। কাজেই, দ্বারবানেরা এই সময়ে সাধারণতঃ কাহাকেও অন্দরে প্রবেশ করিতে দেয় না। তবে, এইমাত্র যে যুবকটি ঢুকিয়া পড়িল তাহার কথা স্বতন্ত্র। দ্বারপালগণ, বেয়ারা-চাপরাসী সকলেই তাহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া অভ্যর্থনা করিল।

মৃগাঙ্ক সান্যালের খাস কামরায় ঢুকিয়া যুবকটি নতমস্তকে তাঁহার পদধূলি লইয়া নম্রভাবে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে ডাকিল, "জ্যাঠামণি"।

শিল্পপতি সরকারী রিপোর্টের পাতা হইতে মস্তক উত্তোলিত করিয়া যুবকটির পানে তাকাইতেই সাগ্রহে ও

ব্যস্তভাবে উঠিয়া,—"আরে অরুণ যে! বস, বস," বলিতে বলিতে হাত ধরিয়া যুবকটিকে পার্শ্বের চেয়ারখানিতে বসাইয়া দিল।

"তারপর, কবে এলে? আমি তো ওয়ার-শ থেকে সেই নভেম্বর মাসে তোমার চিঠি পেয়েছিলাম। অ্যাদ্দিন তোমার কোন সংবাদ না পেয়ে একটু চিন্তিতই হয়ে পড়েছিলাম। 'ভয়িজে' কোন কষ্ট হয়নি ত? তোমার মা-বাবা কবে আসছেন, তাঁরা কেমন আছেন বলো। মনীষাকেও তো কোন চিঠি দাওনি। কী ব্যাপার, বলতো?"—বৃদ্ধ এক নিশ্বাসে এতগুলি কথা বলিয়া ইজি চেয়ারের গায়ে হেলাইয়া পড়িলেন।

অরুণ উত্তর করিল, "ওয়ার-শ থেকে বার্লিন ঘুরে হ্যামবুর্গ হয়ে আবার আমি ম্যাঞ্চেষ্টারে ফিরে গেছলাম—লণ্ডন থেকে আজই প্লেনে বিকেল চারটেয় দমদমে নেবেছি। মা, বাবা ও মৃদুলা 'সী'তে আসছে—ওদের জাহাজ 'টীলবেরী' থেকে ফেব্রুয়ারীর একুশ তারিখে ছাড়বে। ২৩শে জানুয়ারী India House-এ স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে মৃদুলার একটা 'প্রোগ্রাম' আছে—'বি-বি-সি'তেও এবার একটা 'চান্স' হবে বলে আশা করা যায়। ওর জন্যেই মা-বাবাকে এখন কিছুদিন অপেক্ষা করতে হ'লো"

"তা বেশ! Now, come to the business"—বৃদ্ধ একটা ঝাঁকানি দিয়া উঠিয়া বসিলেন।

যুবকটি পাশ্চাত্য দেশে যে সমস্ত শিল্প-কারখানা পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছে তাহা একে একে বলিয়া গেল।

ল্যাঙ্কাশায়ারের কার্পাস ও ইয়র্কশায়ারের পশমশিল্প, ডাণ্ডির পাট ও গ্লাসগোর জাহাজ নির্ম্মাণশিল্প, বেলজিয়াম-জার্ম্মেণী ও রাশিয়ার লৌহ ও ইস্পাতশিল্প, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার কাগজ-শিল্প—ইউরোপের ছোট-বড় সমস্ত দেশের সর্বাধুনিক শিল্পগুলিও বাদ গেল না। মধ্যে মধ্যে শিল্পপতি প্রশ্ন করিয়া করিয়া সে সমস্ত দেশে ভারতীয় কাঁচামালের চাহিদা, রাষ্ট্রের সহিত শিল্পের সম্পর্ক, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার স্থান, সরকারী শিল্প ও শ্রমনীতি এবং বিশেষ করিয়া রুশ-প্রভাবিত দেশগুলির অবস্থা জানিয়া লইলেন। যুবকটি সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়া গেল। প্রসন্ন হাস্যে বৃদ্ধের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি খুশিতে যুবকটির পিঠ চাপড়াইয়া দিলেন।

এইখানে যুবকটির একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। সেই সংগে এই দুই পরিবারের মধ্যে যোগাযোগের পূর্ব্ব ইতিহাসটাও বলিয়া রাখিব।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র অরুণ আই-এ-এস পরীক্ষায় প্রথম হইয়া সংগে সংগেই ভারত সরকারের এক উচ্চ প্রশাসনিক পদে নিয়োগ-পত্র পাইল। সে তো মাত্র এক বৎসর পূর্ব্বের কথা। অরুণ নিয়োগ-পত্রটি লইয়া আসিয়াছিল স্যার মৃগাঙ্ক সান্যালের আশীর্ব্বাদ লাভের আশায়। মৃগাঙ্ক সান্যাল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হতাশার সুরে কহিলেন, "তুমি কি চাকরিটাই নেয়া ঠিক করলে অরুণ?"

"হাঁ। জ্যেঠামণি, ভারতবর্ষের শাসনকর্তৃত্ব ভারতবাসীদের হাতে আসার পরে দেশের শাসনবিভাগে শৈথিল্য ও দুর্নীতি

দেখা দিয়েছে এ কথা যে সত্যি নয়, আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি কিন্তু দেশ-শাসনের যোগ্যতা অর্জন করিনি দেশের স্বাধীনতার যারা শত্রু এ যে কেবল তাদেরই কথা এইটেই আমি প্রমাণ করতে চাই।”

নিয়োগ-পত্রখানি ফিরাইয়া দিয়া শিল্পপতি কহিলেন,—“দেশ শাসন করার চেয়ে দেশের সম্পদ বাড়ানো কি বড় কাজ নয় অরুণ? দেশশাসনের জন্য আইন আছে—শাসনকার্য্য আইনের বাঁধা নিয়মেই চলতে থাকবে। নিয়মবদ্ধ শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর যুপ-কাষ্ঠে তুমি হবে আর একটি বলি। আমাদের দেশের পরাধীনতার সবচেয়ে বড় অভিশাপ—দেশের বড় বড় ব্রেণগুলি চাকরির হাড়িকাঠে মাথা গলিয়ে দিয়ে বসে আছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু, আমাদের মনের পরাধীনতা ঘোচেনি —কাটেনি আমাদের চিন্তার জড়তা। পরাধীন আমলের অভ্যস্ত চিন্তাধারাকেই আমরা এখনও আঁকড়ে ধরে আছি। ছেলে লেখাপড়ায় একটু ভালো হলে আজও আমরা সরকারী উচ্চপদকেই তার পক্ষে একমাত্র মোক্ষধাম বলে মনে করি। দেশের শাসনকার্যে যোগ্য লোকের প্রয়োজন আছে স্বীকার করি, কিন্তু, দেশের শিল্পে ও উৎপাদনকার্যে যোগ্য লোকের প্রয়োজন তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী। আমাদের দেশের শিল্প-বাণিজ্যে তোমাদের মত ব্রেণের বড় অভাব অরুণ।”

বৃদ্ধ উত্তেজনাবশে ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিলেন। অরুণ জানিত জ্যেঠামণির কথার প্রতিবাদ করা চলে না। শিল্পাধিপতি স্যার মৃগাঙ্ক সান্যালের মতের কেহ কোনদিন

বিরোধিতা করিতে সাহস করে না। তাঁহার স্থির সিদ্ধান্তের লৌহবর্ম্মে অরুণের তূণে যুক্তির যতগুলি তীক্ষ্ণ বান আছে সমস্তই প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিবে। অরুণ কোন উত্তর-প্রত্যুত্তর না করিয়া সিঁড়ির দিকে পা বাড়াইতেছে দেখিয়া শিল্পপতি শুধু বলিলেন, "তুমি বরং পীতাম্বরকে একবার পাঠিয়ে দিও।"

অরুণের বাবা পীতাম্বর চৌধুরী মৃগাঙ্ক সান্যালের বাল্যবন্ধু। একযোগে কলেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়া দুই বন্ধু কর্ম্মক্ষেত্রে দুই স্বতন্ত্র পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেও তাঁহাদের যোগাযোগ ও বন্ধুত্ব অবিচ্ছিন্নই রহিয়াছে। পীতাম্বর চোগা-চাপকান পড়িয়া আইনের ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই যথেষ্ট পসার করিয়া লন। পীতাম্বরের কূটবুদ্ধি মৃগাঙ্ক সান্যালকে প্রথম জীবনে সরকারী কর ও শুল্ক নীতির আঁটা-আঁটির মধ্যে অনেক অন্ধকার গলিঘুঁজি অতিক্রম করিয়া দিয়াছে। শিল্পজগতে তাঁহার অপ্রতিহত খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার মূলে পীতাম্বরের অবদান স্যার মৃগাঙ্ক সান্যাল আজিও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করেন।

মৃগাঙ্ক সান্যালের বাহিরের কর্ম্ম জগৎটা যেমন ব্যাপক ও বিরাট, তাঁহার সমাজ-জীবনটা তেমনই সংকীর্ণ। তাঁহার স্বল্প-পরিসর সামাজিক আবেষ্টনীর মধ্যে এক পীতাম্বর ছাড়া আর কাহারও বড় একটা স্থান নাই। পনর বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। একমাত্র মেয়ে মনীষা কলেজহোস্টেলে থাকিয়া পড়িতেছে। আজ বাংলাদেশে এমন কোন যুবক নাই যে স্যার মৃগাঙ্ক সান্যালের কন্যার

পাণিগ্রহণ করিতে পাইলে নিজেকে কৃতার্থ না মনে করিবে। মনীষার মা বাঁচিয়া থাকিলে কি হইত জানি না, শিল্পপতি কিন্তু মনীষার বয়স বাড়িবার সংগে সংগে পীতাম্বরের ছেলে অরুণকেই মনে মনে মনীষার জন্য পাত্র ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। এইজন্য তাঁহাকে আদৌ ভাবিতে হয় নাই, কেননা তাঁহার সমাজসম্পর্কের গণ্ডিটা পীতাম্বর চৌধুরীর পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

দশ বৎসরের বালক অরুণকে যখন তিনি তাঁহার কন্যার পাত্র নির্ব্বাচন করেন, তখন তিনি ভাবিয়াও দেখেন নাই অরুণ ভবিষ্যৎ জীবনে সত্যই মানুষ হইতে পারিবে, না আর পাঁচজন বড় ঘরের ছেলের মতই বিলাসপ্রিয় অকর্মণ্য হইয়া থাকিবে। ক্রোরপতি শিল্পনায়ক স্যার মৃগাঙ্ক সান্যালের জামাতা—যে কোন লোকের পক্ষে এই পরিচয়ই তো যথেষ্ট, সে নিজে উপার্জ্জন করে কিনা, সে বিদ্বান চরিত্রবান কিনা এ প্রশ্ন অবান্তর। হয়তো এই আত্মাভিমান হইতেই তিনি অরুণের ভবিষ্যৎ লইয়া মাথা ঘামানো প্রয়োজন মনে করেন নাই। কিন্তু, আজ যখন অরুণ ভাগ্যক্রমে বিদ্যা, বুদ্ধি, কর্ম ও উদ্যমশীলতায় প্রশংসনীয় কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে, তখন মৃগাঙ্ক সান্যাল তাঁহার ভাবী জামাতার ভবিষ্যৎ কর্মজীবন নির্ব্বাচনে অভূতপূর্ব আগ্রহ ও অনমনীয় দৃঢ়তা প্রকাশ করিলেন।

পীতাম্বর চৌধুরী হাই-কোর্টের জাঁদরেল ব্যারিষ্টার। মোকদ্দমার সওয়ালে তাঁহার ক্ষুরধার বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বিপক্ষের ব্যারিষ্টারগণকে মুহূর্ত্তে পর্য্যুদস্ত করিয়া তোলে। কিন্তু, আত্মপ্রত্যয়শীল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মৃগাঙ্ক সান্যালের কথার তিনি

কোনদিনই প্রতিবাদ করিতে পারেন না। তাহা ছাড়া, অরুণকে যে মৃগাঙ্ক সান্যাল মনীষার পাত্র ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, বন্ধুর এই সঙ্কল্পের কথা না জানিলেও চতুর ব্যারিষ্টার ইহা ভালভাবেই বুঝিতেন যে, মৃগাঙ্ক সান্যালের স্নেহদৃষ্টিই অরুণের ভবিষ্যৎ উন্নতির প্রধান অবলম্বন। মৃগাঙ্ক সান্যালের ইচ্ছা হইলে সরকারী উচ্চপদ কেন, মন্ত্রিত্বও দুর্লভ নহে। তাই মৃগাঙ্ক সান্যাল যখন প্রস্তাব করিলেন যে তিনি অরুণকে বিদেশে পাঠাইয়া আধুনিক বৃহৎ শিল্পগুলি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করাইয়া আনিতে চান, তখন পীতাম্বর চৌধুরী সানন্দে সম্মতি দান করিলেন।

॥ তিন ॥

—"বোঠান, ও বোঠান !"

মনোরমা সবে বাড়ির উঠানে তুলসী মঞ্চে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়া প্রণাম করিতে যাইবে, এমন সময় মনোরমার দেবর হরমোহন হন্তদন্ত হইয়া বাড়িতে ঢুকিয়া বাহিরবাড়ি হইতেই চেঁচাইতে আরম্ভ করিল। দশ বৎসর বয়সে মনোরমা যখন বড় বৌ হইয়া এই সংসারে প্রবেশ করে, তখন এই দেবরটি ছিল আট মাসের শিশু। মনোরমাই তাহাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে। মাথার ঘোমটা ফেলিয়া দিয়া শ্বশুর-শাশুড়ীর সম্মুখে মনোরমাকে অপ্রস্তুত করা বালক হরমোহনের একটা বিশেষ কৌতুক ছিল। পান হইতে চুন খসিলেই মনোরমার আর রক্ষা থাকিত না—চুল ছিঁড়িয়া, কাপড় টানিয়া, মারধর করিয়া মনোরমাকে বড়ই উত্যক্ত করিয়া তুলিত। যেদিন মনোরমা নিজের হাতে ভাত মাখিয়া খাওয়াইয়া দিতে পারিত না, বালক হরমোহন ভাতের থালাটা লাথি মারিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া নিকটবর্ত্তী পেয়ারা গাছটাতে উঠিয়া রান্নাঘরের চালে দুমদাম পেয়ারা ছুড়িয়া মারিত—কোন কোনদিন তাহা খড়ের পুরনো চাল ছিদ্র করিয়া মনোরমার গায়ে মাথায় আসিয়া লাগিত। রাত্রিতে হরমোহনই আবার চুপি চুপি ঘরে ঢুকিয়া অপরাধীর ন্যায় সশঙ্কিত ভাবে মনোরমার কানের কাছে মুখ

আমায় ভাত খাইয়ে দেওনা, তাহলে তো আর আমার রাগ হয় না।”

সেই সব কথা স্মরণ করিয়া মনোরমা আজিও না হাসিয়া থাকিতে পারে না। তারপর হরমোহন যখন এক এক ক্লাসে দুই বৎসর থাকিয়া গ্রামের পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত না করিয়াও ক্লাসগুলি অতিক্রম করিয়া আসিল, তখন বড় ভাই বিরাজমোহন লেখাপড়ায় হরমোহনের মেধা ও আগ্রহের একান্ত অভাব দেখিয়া তাহাকে চৌধুরীদের গোলায় থাকিয়া আড়তদারী ব্যবসায়ে দিতে চাহিলে মনোরমাই স্বামীর সহিত অনেক ঝগড়া-ঝাঁটি, মান-অভিমান করিয়া হরমোহনকে পার্শ্ববর্তী গ্রামের হাইস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেয়। অবশ্য বৎসর না ঘুরিতেই প্রমাণ হইল বিরাজমোহনের কথাই ঠিক—হরমোহনের মস্তকে মস্তিষ্ক বলিয়া যে বস্তু, তাহার একান্তই অসদ্ভাব রহিয়াছে। ব্যবসা করিয়া খাইতে হইলেও মগজ চাই; অগত্যা হরমোহন পিতৃ-পুরুষের যে সামান্য জমি-জমা আছে তাহারই তদারকে লাগিয়া গেল। হরমোহনকে উচ্চশিক্ষিত করিবার আশা ব্যর্থ হইলেও, হরমোহনের প্রতি মনোরমার স্নেহে ভাটা পড়িল না। জমি-জমার কাজ একটু দেখাশুনা করিতে আরম্ভ করিলেই মনোরমা হরমোহনের বিবাহের জন্য একেবারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল এবং হরমোহন বিবাহ করিয়া যেদিন সস্ত্রীক বাড়ি ফিরিয়া আসিল, মনোরমা নিজের গলা হইতে সোনার হারটা খুলিয়া লইয়া পরম স্নেহে বধূবরণ করিয়া লইল।

তাহার পর অনেক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বিরাজমোহনের

মৃত্যুর সংগে সংগেই হরমোহন ও তাহার পত্নীর ব্যবহারে আমূল পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। পত্নী ব্রজসুন্দরীর পরামর্শে হরমোহন একদিন সদরে গিয়া কিছু টাকা ঘুষ দিয়া সরকারী নথিপত্রে সমস্ত জমি-জমা ব্রজসুন্দরীর নামে লিখাইয়া লইয়াছে।

মনোরমা এখন হরমোহনের চক্ষুশূল। সমস্ত দিন গতর খাটিয়াও হরমোহনের মন উঠে না—উঠিতে বসিতে সকল সময়েই মনোরমাকে দেবরের গঞ্জনা শুনিতে হয়। তাই, হরমোহন যখন বাহির-বাড়ি হইতে চেঁচাইতে চেঁচাইতে অন্দরে প্রবেশ করিল তখন মনোরমা আবার নূতন কি অপরাধ করিয়াছে ভাবিয়া শঙ্কিতভাবে গৃহদেবতাকে প্রণাম না করিয়াই উঠিয়া পড়িল।

"বলি ও বোঠান, মেয়ে তো এখন লায়েক হয়েছে। চাকরি করে মাকে মাস-হারা পাঠাচ্ছে। বলি, আর কেন? এখানে থেকে দিনরাত আমাদের শাপমন্যি না করে এখান থেকে চলে গেলেই তো পারো।"

ইদানীং মনোরমা দেবরের মুখে কর্কশ কথা অনেক শুনিয়াছে, কিন্তু আজ যেন হরমোহন কথার সহিত একেবারে বিষ উদ্‌গিরণ করিয়া গেল। মনোরমা বিস্মিত ও অপ্রস্তুত হইয়া কহিল,—"সে কি কথা ঠাকুরপো, আমি তোমাদের শাপমন্যি করতে যাব কেন!"

হরমোহন পূর্ব্বের চেয়েও অধিকতর ঝাঁঝ মিশাইয়া কহিল—"এই যে শুনে এলুম, গাঙ্গুলীদের বাড়ীর সবাই বলাবলি

করছে আমরা তোমাকে দিনরাত গতর খাটিয়ে নিই, খাওয়া-পরায় কষ্ট দিই—এসব কথা তুমি না বললে তারা পেল কোথায়? আমি জানতে চাই, ঘরের শত্রু বিভীষণ না থাকলে বাইরের লোক আমাদের হাঁড়ির খবর কি করে পায়?”

মনোরমার ইচ্ছা হইল বলে—‘যা সত্যি তাই তারা বলে, তারা যা চোখে দেখছে তাই বলছে—মিথ্যা ত আর কিছু বলছে না—বানিয়েও বলছে না। সত্যি কথা বলতে তুমি তাদের মুখ আটকাবে কি করে?’ কিন্তু, যাহাকে নিজের সহোদরের তুল্য স্নেহে আশৈশব লালন-পালন করিয়াছে, তাহার সহিত মনোরমার কলহ করিবার প্রবৃত্তি ছিল না। তাই মনোরমা ধীরে ধীরে অনুত্তেজিত কণ্ঠে কহিল,—“ছিঃ ঠাকুরপো, ভর সন্ধ্যেবেলা তুমি এসব কি বলছ, আমাকে তুমি কোন বাড়ি যেতে দেখ, না কারও সংগে কথা বলতে দেখ?”

হরমোহন জানিত, এ কথা ঠিক। দাদার মৃত্যুর পর হইতেই বোঠান সমস্ত বাহিরের জগৎ হইতে কচ্ছপের ন্যায় হাত পা গুটাইয়া লইয়াছে—পাড়া বেড়ানো তো দূরের কথা, সে বাহিরের কাহারও সহিত বাক্যালাপও করে না। তাহা ছাড়া, চতুর ব্রজসুন্দরী যেভাবে দিনরাত বড়জাকে কড়া পাহারা দিয়া রাখিত তাহাতে মনোরমার পক্ষে এসব কথা বাহিরে প্রচার করা একেবারেই অসম্ভব। কাজেই, আপাততঃ হরমোহন রণে ক্ষান্ত দিয়া যে পথ দিয়া আসিয়াছিল, হুঁকায় কলিকা পরাইতে পরাইতে সে পথ দিয়াই চক্রবর্তীদের দাওয়ায় দাবা

খেলিতে চলিয়া গেল। মনোরমা নির্ব্বাক বিস্ময়ে হরমোহনের পথের দিকে তাকাইয়া রহিল।

আসল কথা, হরমোহনের স্বভাবের মধ্যেই মাতৃসমা এই ভ্রাতৃজায়ার সম্বন্ধে কোথায় যেন একটু দুর্ব্বলতা লুক্কায়িত ছিল। স্ত্রীর প্ররোচনায় সে বেশ আঁট-ঘাঁট বাঁধিয়াই ঝগড়া করিতে প্রবৃত্ত হইত বটে, কিন্তু মনোরমা পাল্টা কিছু বলিলেই মনোরমার মুখোমুখি দাঁড়াইয়া তাহার মুখে সহসা আর কোন উত্তর যোগাইত না। বেগতিক হরমোহন কাজের অছিলায় খুব ব্যস্তসমস্তভাবে বাটীর বাহিরে চলিয়া গিয়া স্ত্রীর রোষ-কটাক্ষ ও ভর্ৎসনা হইতে আত্মরক্ষা করিত।

কিন্তু, হরমোহনের মনে যে দুর্ব্বলতা, তাহা ব্রজসুন্দরীর থাকিবার কথা নহে। তাই, হরমোহনকে পশ্চাদপসরণ করিতে দেখিয়া সে নিজেই অগ্রসর হইয়া আসিল।

ব্রজসুন্দরী পান চিবাইতে চিবাইতে সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া হাঁকিল, "দিদি, উনুনে আঁচ যে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ভাত চড়াবে কখন? ছেলেটা ভাতের জন্যে কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে যাচ্ছে, বলি, তা খেয়াল আছে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছ অত? উনি অন্যায়তো কিছু বলেন নি। মেয়ে মেম সেজে চাকরি করছে, তোমার আর ভাবনা কি। এখানে শাক-ভাতের জন্যে মাটি আঁকড়ে পড়ে না থেকে মেয়ের কাছে গিয়ে মা-মেয়ে মনের সুখে ঘিয়ে-দুধে খেলেই তো পারো।"

একটু থামিয়া, বোধ করি মনোরমার উপর এই কথার কি প্রতিক্রিয়া হইতেছে তাহা জানিবার জন্য ক্ষণকাল অপেক্ষা

করিয়া ব্রজসুন্দরী চিবাইয়া চিবাইয়া বলিতে লাগিল—"শহরে তো শুনি চাকরিওয়ালা মেয়েরা নিজেরাই বর ঠিক করে নেয়। আমাদের রমা ইংরাজি শিখছে—একটা শিকার ধরতে তার আর কতক্ষণ। ভালই হয়েছে দিদি, মেয়ের বিয়ের জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। বট্‌ঠাকুরের ইনসুওরের টাকাটা তোলাই থাকবে।"

মনোরমা কোন উত্তর-প্রত্যুত্তর করিল না। নিজের মেয়ের বয়সী ছোটজার সহিত এই শ্রেণীর জঘন্য কলহে প্রবৃত্ত হইতে তাহার ঘৃণা বোধ হইল। মনোরমা বিমর্ষভাবে রান্না ঘরে গিয়া ঢুকিল। বিধবা হইলে কি হয়, রাত্রিবেলাতেও হেঁসেলের কাজ না করিয়া তাহার নিস্তার নাই।

উনুনে ভাত চাপাইয়া মনোরমা আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। রমা এই মাসে মনিঅর্ডার করিয়া তিরিশ টাকা পাঠাইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহাতেই রমা চাকরি করে, এই কথা সমস্ত গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল কেমন করিয়া। সে তো ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানে না। রমা তো তাহাকে এ বিষয়ে কিছুই লিখে নাই। আর রমাও এমন মেয়ে নয় যে, মাকে না জানাইয়া, মায়ের মত না লইয়াই কলেজ ছাড়িয়া দিয়া চাকরিতে ভর্তি হইবে। রমার শেষ যে চিঠিটা আসিয়াছে তাহাতে তো চাকরি কিংবা মাসহারা পাঠাইবার কথার কোন উল্লেখই নাই। রমা চাকরি করুক আর নাই করুক, মনোরমা যে এ সংসারে আর বেশীদিন থাকিতে পারিবে না, ইহা সুনিশ্চিত। দেবর জায়ের আসল উদ্দেশ্য যে তাহাকে ভদ্রাসন ছাড়িয়া যাইতে

বাধ্য করা ইহা মনোরমার কাছে ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিল। নিজের হাতে গড়া সংসার ও বহুকালের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার স্মৃতি-বিজড়িত এই বাস্তুভিটা ছাড়িয়া যাইবার কথা মনে উঠিতেই তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিয়া সমস্ত ঝাপসা বোধ হইতে লাগিল। এক হাতে চোখ মুছিয়া আর এক হাত দিয়া মনোরমা ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ির ঢাকনাটা নামাইয়া রাখিল।

॥ চার ॥

পরদিন অপরাহ্ণে জগত্তারিণী হোস্টেলের গাড়িবারান্দায় অরুণের হাল-মডেলের 'প্যাকার্ড' গাড়িখানা সশব্দে আসিয়া দাঁড়াইল। দিনান্তের ক্লান্ত সূর্য্যের এক ঝলক রক্তাভ রশ্মি গাড়ির সর্ব্বাঙ্গে যেন আবীর লেপিয়া দিল। গঞ্জিকাসেবী বৃদ্ধ দ্বারবান মৌতাতের আমেজে ঝিমাইতেছিল—গাড়ির শব্দে হকচকাইয়া গিয়া নেশার ঘোরে পাগড়িটা উল্টাভাবে মাথায় জড়াইয়া কায়দামাফিক এক সেলাম ঠুকিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। অরুণ মৃদু হাসিয়া ভিজিটিং কার্ডে নিজের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া দিয়া দ্বারবানের হস্তে দিল ও মনীষাকে সংবাদ দিতে বলিয়া দর্শনার্থীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরখানিতে আসিয়া বসিল।

কাগজের সুদৃশ্য মোড়কটি খুলিয়া নিউ মার্কেট হইতে সদ্য কিনিয়া-আনা সুবিখ্যাত বসরার গোলাপের গুচ্ছটি হাতে করিয়া অরুণ উৎকণ্ঠিতভাবে মনীষার আগমনের অপেক্ষা করিতে লাগিল। এই হোস্টেলে অরুণ আজই প্রথম আসে নাই। কিন্তু আজিকার সহিত সে সব দিনের পার্থক্য অনেক। দীর্ঘ এক বৎসরকাল ইউরোপের শিল্প-সমৃদ্ধ দেশগুলি পরিভ্রমণ করিয়া অরুণ সবে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। তাহার পর্য্যটন-লব্ধ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এ দেশের শিল্প-জগতে এক নবযুগের সূচনা করিবে। দেশের বিভিন্ন শিল্প-সংগঠন

হইতে ইতোমধ্যেই তাহাকে অভিনন্দন জানাইবার বহু আয়োজন হইয়াছে। কিন্তু, বিদেশের শিল্পাঙ্গন হইতে বিজয়ীর বেশে ফিরিয়া অরুণের মন সর্ব্বপ্রথমে মনীষার নিকট হইতেই জয়মাল্য পাইবার জন্য সমধিক ব্যগ্র হইয়াছে।

মনীষার সহিত তাহার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কৈশোর হইতে। সে দিনের তুইটি বালক-বালিকার নিছক ক্রীড়া-বিলাস যৌবনে আসিয়া নিগূঢ় হৃদয়সম্পর্কে পরিণত হইয়াছে। বিদেশের কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যেও মনীষার লীলায়িত প্রণয়োচ্ছল মুখখানি বারংবার মনে হইয়া অরুণকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাই, দীর্ঘ অবকাশের পর বহু আকাঙ্ক্ষিত দর্শন-লাভের সম্ভাবনায় পুলকিত অরুণের মনে সাগর তরঙ্গের ন্যায় একের পর এক কল্পনা আসিয়া ভিড় জমাইতে লাগিল।

প্রথম দর্শনে মনীষা তাহাকে কিভাবে অভ্যর্থনা করিবে, বহুদিন কোন চিঠি না লিখিবার জন্য মনীষা তাহাকে কি বলিয়া অনুযোগ করিবে, বিদেশে অরুণের আশাতীত সাফল্যলাভের সংবাদে মনীষা কিভাবে কতখানি আনন্দ প্রকাশ করিবে, গোলাপের গুচ্ছটি সে কিভাবে নিজ হস্তে মনীষার কবরীবন্ধে গুঁজিয়া দিবে, মনীষার মৃণাল হস্ত তুইটি তুলিয়া পুষ্পপেলব করতল তুটিতে আবেগভরে তুটি প্রগাঢ় চুম্বন আঁকিয়া দিলে কেমন হয়, ইত্যাদি নানা সুখকর কল্পনায় তাহার মন আলোড়িত হইতে লাগিল। প্রথম দর্শনের আবেগময় মুহূর্ত্তটিকে বাহিরের কৌতূহলী দৃষ্টি হইতে আড়াল করিবার জন্য অরুণ উঠিয়া উন্মুক্ত দরজাটা খানিক ভেজাইয়া দিয়া আসিয়া বসিল।

এদিকে মনীষা ব্যাড্‌মিণ্টন খেলিতে বাহির হইয়াছে। দ্বারবান মনীষাকে না পাইয়া অরুণের স্বাক্ষরিত কার্ডটি রমার হাতে দিয়া বলিল, এক সাহেব মনীষাদির সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে। রমা গা ধুইয়া আসিয়া চুল বাঁধিতে বসিয়াছিল। ইচ্ছা হইল বলিয়া দেয়, 'বল্‌গে মনীষা হোষ্টেলে নেই, ফিরতে দেরী হবে'। কিন্তু আবার ভাবিল, এইভাবে দ্বারবানকে দিয়া বলিয়া পাঠানো অভদ্রতা হইবে। মনীষার অনুপস্থিতিতে তাহারই গিয়া বলিয়া আসা উচিত। মুখে বলিল—"যা ভিজিটর্স-রুমের আলোটা জ্বেলে দে, আমি যাচ্ছি।" কার্ডটা হাতে লইয়া অতি সুদৃশ্য পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে লিখিত নাম ও ঠিকানা পড়িল—অরুণ প্রকাশ চৌধুরী, পি ৫৩, ল্যান্সডাউন রোড।

স্মৃতির অতল সমুদ্র হাতড়াইয়াও রমা এই নাম স্মরণ করিতে পারিল না। মনীষার সহিত যাহারা সচরাচর দেখা করিতে আসে তাহাদের সকলের নামই তো সে জানিয়াছে। মনীষা তো কোন কথাই তাহাকে গোপন করে না—তাহার জীবনের সমস্ত কথাই সে রমাকে অকপটে বলিয়াছে। কিন্তু অরুণ চৌধুরী নামে কাহারও সহিত মনীষার পরিচয় আছে বলিয়া তো সে শুনে নাই। হয়ত দূর সম্পর্কের কোন আত্মীয় হইবে। রমা তাড়াতাড়ি খোঁপাটা এলো করিয়া বাঁধিয়া পরিধানের আধময়লা শাড়ীটাই একটু গোছগাছ করিয়া লইয়া বাহির হইয়া আসিল। অরুণ মনীষার জন্য অপেক্ষা করিয়া করিয়া ঘরময় অস্থিরভাবে পায়চারি করিতেছিল। এমন সময় রমা

আধ-ভেজানো দরজাটা মৃদুশব্দে ঠেলিয়া দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেই অরুণ আগ্রহভরে ঘুরিয়া দাঁড়াইল ও রমার সহিত চোখাচোখি হইতে দুইজনেই দৃষ্টি অবনত করিল।

রমা সলজ্জভাবে ছোট্ট একটি নমস্কার করিয়া অনুচ্চকণ্ঠে কহিল,—"আপনাকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি, মাফ করবেন।"

অরুণ কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। সে যখন একান্তরূপে মনীষারই প্রতীক্ষা করিতেছিল তখন যে মনীষা ছাড়া আর কেহ আসিয়া তাহাকে এমনভাবে অপ্রস্তুত করিয়া দিবে তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। সে ভদ্রতাসূচক প্রতি-নমস্কার করিতেও ভুলিয়া গেল। অরুণের বিস্ময়বিমূঢ় ভাব দেখিয়া রমা ক্ষণকাল পরে নিজেই আত্মপরিচয় দিয়া তেমনি ধীরভাবে কহিল—"আমি মনীষার বন্ধু ও রুম-মেট্। মনীষা ব্যাড্‌মিণ্টন টুর্ণামেণ্ট খেলতে বেরিয়েছে—ফিরতে হয়তো একটু দেরী হবে। আপনি কি আর একটুকাল অপেক্ষা করে যাবেন—যদি এসে পড়ে?"

শেষের কথাটিতে অরুণ এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি হইতে মুক্তি পাইবার একটা সহজ পথের ইঙ্গিত পাইয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। চোখে-মুখে অসম্ভব ব্যস্ততার ভাব ফুটাইয়া কব্‌জি ঘড়িটার দিকে বার দুই তাকাইয়া একেবারে বাহির হইয়া পড়িবার উপক্রম করিয়া কহিল, "না, আমাকে এক্ষুণি বেরোতে হবে, সাড়ে ছ'টায় আমার আর একটা অ্যাপয়েন্ট-মেণ্ট আছে।" সাহস সঞ্চয় করিয়া পুনরায় কহিল, "আপনি

মনীষার বন্ধু, কিন্তু এর আগে আপনাকে কখনও দেখেছি বলে তো মনে হয় না।"

রমা মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল,—"আমি এ হোস্টেলে নতুন ভর্ত্তি হয়েছি। তা ছাড়া, মনীষার সংগে আমার পরিচয় বেশী দিনের নয়।"

এবার আর অরুণ সৌজন্য বিনিময় করিতে ভুল করিল না। গাড়িতে উঠিয়া কিছু অতিরিক্ত জোরের সহিত দরজাটা সশব্দে বন্ধ করিয়া সংগে সংগে গাড়িতে ষ্টার্ট দিল। বেগে ধাবমান ম্যারিন কালারের গাড়ীটার দিকে মুহূর্ত্তকাল অন্যমনস্কভাবে তাকাইয়া থাকিয়া রমা নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

ইতস্ততঃ ঘোরাঘুরি করিয়া গাড়িটা এস্‌প্ল্যানেডের চৌমাথায় আসিয়া দাঁড়াইল। সাড়ে ছ'টায় তাহার অন্যত্র অ্যাপ্লয়িন্টমেন্ট আছে, আচমকা এই মিথ্যা কথাটা বলিয়া ফেলিয়া অরুণ এক মহা সমস্যায় পড়িয়াছে।

মনীষা হয়তো এতক্ষণে হোস্টেলে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু, তাহার তো ফিরিয়া যাইবার উপায় নাই; কেননা, ফিরিয়া গেলে সেই মেয়েটির কাছে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হইতে হয়। তাহার চেয়ে যদি সে এই সময়টুকু হোস্টেলে অপেক্ষা করিত কিংবা বলিয়া আসিত একটু পরেই সে আবার ঘুরিয়া আসিবে, তাহা হইলেই সকল দিক রক্ষা হইত। সদ্য ইউরোপ প্রত্যাগত বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র অরুণ একটি সামান্য কলেজে-পড়া মেয়ের কাছে এইভাবে

অপদস্থ ও পরাজিত হইয়া নিজেকে অপমানিত ও লজ্জিত বোধ করিতে লাগিল।

মেয়েটি যখন মনীষার বন্ধু, তখন একদিন না একদিন তাহার সহিত আবার দেখা হইবেই—ভাবিয়া অরুণের বিষম লজ্জা করিতে লাগিল। উদ্দেশ্যহীনভাবে অরুণ রেড রোড দিয়া গাড়ি ছুটাইয়াছে। মনের মধ্যে মনীষা ও এই নতুন দেখা মেয়েটি একের পর এক ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

চাল-চলন ও বসন-ভূষণ দেখিয়া মনে হইবে মেয়েটি সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের, কিন্তু চেহারায় এমন একটি বিশেষত্ব আছে যাহা কাহারও দৃষ্টি এড়ায় না। তাহাকে নিখুঁত সুন্দরী বলিলেও সবকিছু বলা হয় না। সুন্দরী বলিয়া মনীষারও তো যথেষ্ট খ্যাতি আছে—মনীষারও মুখকান্তি অনিন্দনীয়। কিন্তু এই মেয়েটির কমনীয় মুখশ্রীতে কোমলতার সহিত গাম্ভীর্য্য মিশিয়া এমন একটা অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে যাহা সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে। লীলা-চঞ্চল মনীষার রূপ-যৌবন পর্ব্বতগাত্রনিঃসৃত ঝরণার মতই উচ্ছল ও কলনাদিনী; অপরদিকে, এই মেয়েটির অনুপম দেহলাবণ্য সমুদ্রের মতই গভীর ও অতলস্পর্শী। ইহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু কামনার কলুষতা ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ধনুকের মত বাঁকা ঘনকৃষ্ণ ভ্রূযুগলের দ্বারা রেখায়িত বিকচোন্মুখ শতদলের ন্যায় ডাগর দুইটি চক্ষুতে সতত প্রশান্ত তন্ময়তা বিরাজ করিতেছে। সকলের মধ্যে থাকিয়াও যেন সে সর্ব্বদাই নিজ মহিমায় একটা স্বাতন্ত্র্য ও

দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিতেছে ; অথচ, ইহাকে উপেক্ষা করিয়া যায় এমন শক্তি কাহারও নাই। অরুণের বিমুগ্ধ মনের পর্দ্দায় মনীষার পাশে বারবার এই মেয়েটির ছবি ভাসিয়া উঠিয়া তাহাকে কেমন যেন উন্মনা করিয়া তুলিল।

রাণী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিসৌধের নিকটে গাড়ি থামাইয়া অরুণ একটা বেঞ্চির উপরে গিয়া বসিল। তাহার উদ্‌ভ্রান্ত মন কিছুতেই শান্ত হইতে চাহিল না! অন্যমনস্কভাবে গোলাপের পাপড়িগুলি এক এক করিয়া ছিঁড়িয়া পার্শ্ববর্ত্তী জলাশয়ে ভাসাইয়া দিল। সামনের গির্জার ঘড়িটাতে ঢং ঢং করিয়া আটটা বাজিতে অরুণ প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়া গেল।

* * *

এই ছোট্ট ঘটনায় রমা নিজেও কম লজ্জিত ও বিস্মিত হয় নাই। পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হইতে সে ধরিয়া লইয়াছিল, মনীষার দর্শনপ্রার্থী ভদ্রলোকটী মনীষার বাবার কোন প্রৌঢ়বয়স্ক বন্ধু কিংবা তাহাদের দূর সম্পর্কের কোন আত্মীয় হইবে। সেই জন্যই রমা বেশ-বিন্যাসের দিকে কিছুমাত্র মনোযোগী না হইয়া যে ময়লা আটপৌরে শাড়ীখানা পরিধানে ছিল, তাহা পরিয়াই অবিন্যস্ত চুলের গোছাটাকে কোনরকমে আলগাভাবে খোঁপা করিয়া চলিয়া আসিয়াছিল। দেয়ালে প্রলম্বিত বড় আয়নাটায় এখন নিজের চেহারা দেখিয়া রমার লজ্জায় মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। সে নিজেকে মনীষার বন্ধু বলিয়া পরিচয় না দিলেই পারিত, ভদ্রলোক কি ভাবিয়াছেন কে

জানে। তাহার জন্য পাছে মনীষার মর্য্যাদাহানি হয় ভাবিয়া সে উদ্‌বিগ্ন হইল।

আচ্ছা, মনীষার সহিত এই ভদ্রলোকটির কি সম্বন্ধ হইতে পারে। বয়স তো মোটেই বেশী নয়। হাতে গোলাপের তোড়াটি মনীষার সহিত অন্তরঙ্গ পরিচয়েরই সাক্ষ্য বহন করিতেছে। রমার স্বভাবে কাহারও ব্যক্তিগত বিষয়ে কৌতূহল অল্পই ছিল। কাজেই, এই চিন্তা মনে উদয় হইয়া আবার তখনই মিলাইয়া গেল—কোনরূপ চাঞ্চল্য আনিতে পারিল না।

॥ পাঁচ ॥

রাত ৭টা বাজিতেই মনীষা হোস্টেলে ফিরিয়া আসিল। মৃগাঙ্ক সান্যালের রোল্‌স্‌ রয়েস গাড়িটা মনীষাকে হোস্টেলে পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া গেল। শীতের রাত্রিতে ইহারই মধ্যে কলিকাতার পূর্ব্বপ্রান্তে ক্যানাল রোডের এই অঞ্চলটা জনবিরল হইয়া আসিয়াছে। গ্যাস লাইটের মৃদু আলো লাইটপোষ্টের চারিপাশে জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে—ঘন কুয়াশা ভেদ করিয়া বাহিরে আসিতে পায় না। সমস্ত অঞ্চলটা তাই নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন—মাঝে মাঝে দুই একজন পথচারীর পদশব্দে নিঝুম পাড়াটা মুহূর্ত্তের জন্য সচকিত হইয়া উঠে।

মনীষা চুপি চুপি দরজাটা ফাঁক করিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল, রমা একটি বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্রের সান্ধ্যসংস্করণের উপর ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। সংগে সংগে তাহার মাথায় একটা দুষ্টবুদ্ধি খেলিয়া গেল। ভিতরে না ঢুকিয়া বাহির হইতে বন্ধ দরজায় টোকা মারিয়া গম্ভীর পুরুষালি গলায় বলিল,—"হ্যালো মিস্‌! ভিতরে আসতে পারি ?" ভয়ে ও বিস্ময়ে চমকাইয়া উঠিয়া রমা ভীতজড়িত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "কে!—কে আপনি ?"

সংগে সংগে ব্রীচ ও জ্যাকেট পরিয়া একহাতে র‍্যাকেট ও অন্যহাতে একটি সুদৃশ্য কাগজের বাক্স লইয়া যে মনুষ্যমূর্ত্তি

ভিতরে প্রবেশ করিল, রমাও তাহাকে সহসা মনীষা বলিয়া চিনিতে পারিল না। যখন চিনিল তখন আর না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

মনীষা কাগজের বাক্সটি টেবিলের উপরে রাখিয়া দুই হাতে রমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া চুমু খাইয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। পরক্ষণেই কি মনে করিয়া গম্ভীরভাবে কাগজের বাক্সটি খুলিয়া একক চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রফিটা বাহির করিয়া রমার হাতে দিয়া কহিল—"এই নে রমা, আমার প্রথম পাওয়া প্রাইজটা আমি তোকে দিলাম,—এটা তোর জন্মদিনের উপহার। আমি না থাকায় তোর জন্মদিনে কোনই আনন্দ হলো না—সারাদিনটা তুই একা একা কাটিয়েছিস্, না রে রমা? আমায় ক্ষমা কর ভাই।" বলিতে বলিতে মনীষার কণ্ঠস্বর ভিজিয়া আসিল।

বাস্তবিক আজ যে তাহার জন্মদিন, এ কথা রমার নিজেরই খেয়াল ছিল না। সেই ভোর বেলা ঘুম হইতে উঠিয়া ক্যালেণ্ডারের দিকে নজর পড়িতেই তারিখটা স্মরণ করিয়া রমা মনীষাকে বলিয়াছিল। কিন্তু, তাহার পর আর একবারও জন্মদিনের কথাটা তাহার মনে হয় নাই। মনে না হইবারই কথা। গরীবের ঘরের মেয়ে রমার জন্মদিনে কোনদিনই তেমন ঘটা হয় নাই। এই সামান্য ঘটনাটা মনীষা স্মরণ রাখিয়াছে এবং জন্মদিনে কোন উৎসব করিতে পারিল না বলিয়া আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া নিজের অসামান্য কৃতিত্বের পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত মূল্যবান ট্রফিটা নিজে না

রাখিয়া রমাকে দিবার জন্য আগ্রহ করিতেছে দেখিয়া রমার মন মনীষার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসায় একেবারে নুইয়া পড়িল।

"এই দ্যাখ্ মনীষা, তুই এসে অবধি এমন আরম্ভ করলি যে কাজের কথাটাই তোকে বলবার ফুরসত পেলাম না। কে এক অরুণ প্রকাশ চৌধুরী এস্‌ছিলেন তোর সঙ্গে দেখা করতে,"—বলিতে বলিতে রমা অরুণের স্বহস্তলিখিত নাম ও ঠিকানাযুক্ত কার্ডটা আগাইয়া দিল।

"কি নাম বল্‌লি রমা? অরুণ চৌধুরী? ঠিক জানিস্?—কই, দেখি কার্ডটা"—মনীষা রমার হাত হইতে কার্ডটা ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল ও ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া সংগে সংগে ব্যস্তভাবে উঠিয়া গেল।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘরে ঢুকিয়া মনীষা কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই কহিল, "টেলিফোনটা ব্যবহার কর্ত্তে পারি?"

মিসেস্ মাতঙ্গিনী হাজরা এক তাড়া ক্যাসমেমো লইয়া হিসাব লিখিতে ব্যস্ত ছিল। হাঁ-না কিছুই না বলিয়া টেলিফোনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সম্মতি জানাইল। রিসিভারটা তুলিয়া মনীষা ইক্‌স্‌চেঞ্জ অপারেটরকে নম্বর বলিয়া দিল, "সাউথ ডবল টু ডবল টু।"

"হ্যালো!......কে আপনি?........রঘু?..........দাদাবাবু কই রে......বাসায় নেই?......কখন ফিরবেন কিছু বলে গেছেন তোকে......ও! কিছুই বলে যাননি.......না?.......কখন বেরিয়েছেন বলতে পারিস....... বিকেল চারটেয়?.......আচ্ছা

রঘু, তোর দাদাবাবু কবে ফিরেছেন রে……কালকে?…… মাসীমা, মেসোমশায়, মৃদুলা—তারাও বাসায় নেই নাকি…ও! বুঝেছি, দাদাবাবু একাই এসেছেন, ওরা পরে আসছেন……।"

নিরাশ হইয়া মনীষা রিসিভারটা রাখিয়া দিয়া ঘরে আসিয়া বিছানার উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। অনেকটা আপন মনেই বলিতে লাগিল, "আমি ব্যাড্মিণ্টন খেলা ছেড়ে দোব।"

"সে কিরে! আবার কি হোল তোর?" কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভে চোখ রাখিয়াই রমা নির্লিপ্তভাবে প্রশ্ন করিল। খেয়ালী মনীষার কখন কি মর্জি হইবে তাহা ভাবিয়া এখন আর রমা উদ্‌বিগ্ন হয় না।

"এই ছ্যাখ্ না ব্যাড্মিণ্টন খেলতে গিয়েইতো তোর জন্মদিনটা মাটি করলুম্, অরুণদার সঙ্গেও দেখা হোল না। পুরো এক বছর পরে দেশে ফিরলেন অরুণদা। কাল সন্ধ্যের এসেছেন, আর আজকেই ছুটে এস্‌ছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে!….ও!….অরুণদার কথা তোকে বলিনি বুঝি?"

আসল কথা, এতদিন মনীষা অরুণের প্রসঙ্গ ইচ্ছা করিয়াই এড়াইয়া গেছে। অরুণ ইউরোপে চলিয়া যাইবার পর অরুণের মা ও মৃদুলার চিঠি পড়িয়া মনীষা বুঝিয়াছে অরুণদার সম্বন্ধে এখন আর কাহারও সহিত আলোচনা করা চলে না। মৃদুলাটা এই বয়সেই এমন ফাজিল হইয়াছে—মনীষাকে এক চিঠিতে স্পষ্টই লিখিয়াছিল, "এবার একা একা আমার ভাল লাগছে না ভাই বৌদি, এর পরের বারে যখন আসবো তুমি নিশ্চয়ই থাকবে আমাদের সংগে।"

আসুক একবার মৃদুলা, মনীষা তাহাকে এমন শাসন করিবে যে সে জীবনে ভুলিতে পারিবে না। কিন্তু মৃদুলার এই 'বৌদি' সম্বোধনটা মনীষার বড় ভালো লাগিয়াছে। রাত্রিতে মশারি খাটাইয়া মনীষা কতদিন যে চিঠিটা বাহির করিয়া এই অংশটা বার বার পড়িয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। তদবধি অরুণের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িলেই লজ্জা আসিয়া শিরটাকে টানিয়া ধরে, মুখ লাল হইয়া উঠে—বুকের ভিতরটা কি এক অজ্ঞাত আনন্দে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে থাকে। তাই লজ্জাবশতঃই মনীষা আর সব কথাই রমাকে বলিয়াছে, কেবল অরুণের প্রসঙ্গটাই বাদ রহিয়া গেছে। কিন্তু আজ যখন অরুণ আসিয়াই পড়িয়াছে, এতদিন ধরিয়া যে সম্ভাবনাটাকে মনীষা অতি সঙ্গোপনে মনের মধ্যে লালন-পালন করিয়া আসিয়াছে তাহা বাস্তবে পরিণত হইতে আর বিলম্ব নাই, তখন উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগের প্রবল স্রোতে মনীষার হৃদয়ের অর্গল খুলিয়া গেল।

মনীষা আবেগভরে বলিয়া চলিল, "অরুণদা কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নামজাদা স্কলার। ইতিহাসের অনার্স পরীক্ষায় রেকর্ড নম্বর পেয়ে 'ঈশান স্কলারশিপ' পেয়েছিলেন। তুই ইতিহাসে অনার্স নিয়েছিস জানলে অরুণদা খুব খুশী হবেন ; আমাদের হোস্টেলে এলে তুই একদিন তাঁর কাছে পড়িস, দেখবি ইতিহাসে তাঁর কী গভীর জ্ঞান, আর কী চমৎকার বোঝাতে পারেন। অরুণদা যেবার 'ঈশান' স্কলার হয়ে বেরুলেন, সে বছরই তিনি Indian Administrative Service-এর পরীক্ষায় প্রথম হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র

দপ্তরে একবারেই অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারীর পদ পেলেন। কিন্তু বাবা তাঁকে চাকরি নিতে দিলেন না। বাবা বললেন, অরুণের মত মেধাবী ছেলেকে আমি চাকরির জাঁতা-কলে নিষ্পিষ্ট হতে দেব না—সরকারী বিভাগের চেয়ে দেশের শিল্পে-বাণিজ্যে ব্রেণের প্রয়োজন বেশী—বললেন, বড় চাকরি নিয়ে ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করার চেয়ে দেশের সম্পদ ও সমৃদ্ধি বাড়িয়ে সমগ্র জাতির কল্যাণ করা অনেক বড় কাজ। বাবাই তো অরুণদাকে ইউরোপ পাঠিয়ে সেখানকার সব বড় বড় Industry দেখিয়ে আনলেন। অরুণদাকে বাবা নিজের ছেলের মতোই স্নেহ করেন। আমার তো মনে হয়, অরুণদার জন্যে বাবা যা কচ্ছেন, নিজের ছেলে থাকলেও তার জন্যে অতটা করতেন কি না সন্দেহ। আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন অরুণদা ও আমার মধ্যে ঝগড়া হতো বাবা কাকে বেশী ভালোবাসেন এই নিয়ে।

রমা মুগ্ধ বিস্ময়ে কথাগুলি শুনিয়া যাইতে লাগিল—প্রত্যেকটি কথার মধ্যে মনীষার যে আন্তরিকতা ও হৃদয়াবেগ মেশানো ছিল তাহা রমার কাছেও গোপন রহিল না।

মনীষা আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "অরুণদা কেবল পড়াশুনাতেই যে ভালো তা নয়—খেলাধূলা, ব্যায়াম-কুস্তিতেও বাংলাদেশে তাঁর জুড়ি মেলা শক্ত। আর সে কি সুপুরুষ দেখতে—আজকালকার ছেলেদের মধ্যে অত সুন্দর স্বাস্থ্য ও মজবুত বলিষ্ঠ চেহারা বড় একটা দেখা যায় না। কি জানি এখন হয়তো আরও কতো সুন্দর হয়েছেন।" শেষের কথাটি যেন মনীষা অনেকটা স্বগত ভাবেই বলিল।

বাস্তবিক অরুণের বুদ্ধিদীপ্ত বলিষ্ঠ চেহারা রমারও দৃষ্টি এড়ায় নাই। কিন্তু এতক্ষণ পরে রমা আর বলিতে সাহস করিল না যে, অরুণকে সে দেখিয়াছে—অরুণের সহিত তাহার পরিচয়ও হইয়াছে। মনীষার সহিত দেখা না হইতেই রমা, বলিতে গেলে, উপযাচক হইয়াই অরুণের সহিত যে পরিচিত হইয়া আসিয়াছে—এ কথা প্রকাশ করিলে মনীষা হয়তো খুশী না হইতে পারে। অরুণ মনীষার খোঁজে আসিয়াছিল এই সংবাদটা যখন সে মনীষাকে দেয় তখনই যদি সমস্ত ঘটনাটা বলিয়া দিত তবে আর ভুল বোঝাবুঝির কোন অবকাশ থাকিত না। কিন্তু, মনীষা তাহাকে সে সুযোগ দিল কোথায়? কথা শেষ না করিতেই তো হন্তদন্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল। তখন না বলিয়া এতক্ষণ পরে এখন প্রকাশ করিতে গেলে মনীষা তাহাকে ভুল বুঝিতে পারে। তাহা ছাড়া, অরুণের সম্বন্ধে মনীষার যে আগ্রহ ও আন্তরিকতার পরিচয় পাইয়াছে তাহাতে মনীষার মনে এতটুকু ব্যথা দিতে রমার প্রাণে বাজিল। তাই ঘটনাটা সে একেবারেই চাপিয়া গেল।

সে রাত্রে মনীষা বিছানায় শুইয়া এপাশ-ওপাশ করিয়া কাটাইল—চোখের পাতা একত্র করিতে পারিল না। বারংবার বেড সুইচটা টিপিয়া ঘড়ি দেখিতে লাগিল ভোর হইতে আর কত বাকি। সকাল বেলাই অরুণকে দেখিবার, অরুণের সহিত কথা কহিবার দুর্নিধার আকর্ষণে সে বিনিদ্র রজনী ছটফট করিয়া কাটাইল। এই এক বৎসরে অরুণের মা ও মৃদুলার পত্রে যে আশা ব্যক্ত হইয়াছিল

তাহা নিশ্চয়ই অরুণের অজ্ঞাত নয়। সেই কথা স্মরণ করিয়াও অরুণের পাশে নিজেকে বধূবেশে কল্পনা করিয়া মনীষার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

আর রমারও সে রাত্রে ভাল করিয়া ঘুম আসিল না। তাহার জন্মদিনে ভোরবেলা হইতে সমস্তদিন যে ঘটনাগুলি ঘটিয়া গেল তাহা একে একে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে অরুণের সহিত দেখা হইয়া যাওয়াটাকে সে নিতান্তই একটা আকস্মিক ঘটনা বলিয়া ধরিয়া লইল; কেননা, ইহার সহিত রমার নিজের কোনই সম্পর্ক থাকিতে পারে না। তথাপি মনীষার মুখে অরুণের যে পরিচয় সে পাইয়াছে তাহাতে এই আকস্মিক ঘটনাটাকে সে মন হইতে একেবারে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিল না। বস্তুতঃ, ঐ অতি প্রিয়-দর্শন যুবকটির মধ্যে যে এতগুলি গুণ আছে, তাহা সে প্রথমে কল্পনাও করিতে পারে নাই।

অরুণের সহিত তাহার দেখা হইবার ঘটনাটিকে গোপন করিয়া সে কী অন্যায় করিয়াছে? মনীষা যদি অরুণের নিকট জানিতে পারে! অরুণ নিশ্চয়ই তাহাকে এই কথা বলিয়া দিবে। মনীষা তাহা হইলে রমার সম্বন্ধে কি মনে করিবে কে জানে। হয়তো কাজটা ভালো হইল না—মনীষাকে বলিয়া দেওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু, মনীষার প্রাণে সামান্য আঘাত লাগিতে পারে এই ভয়েই তো রমা সে কথা প্রকাশ করে নাই। মনীষা মনে করিবে রমা তাহার

সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। করুক। রমার মনে তো কোনো অভিসন্ধি ছিল না।

এইরূপ নানা চিন্তায় রমাও অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া কাটাইল। যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল তখন সমস্ত ঘরখানি শীতের মিষ্টি রোদে ভরিয়া গেছে। মনীষা স্নান ও প্রসাধন সারিয়া বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া গাড়ির অপেক্ষা করিতেছে।

এই দৃশ্যও কিছু নতুন নয়।

আজ রবিবার, ছুটির দিন। প্রতি রবিবার মনীষা নিজের বাড়িতে চলিয়া যায় ও সমস্ত দিনটা কাটাইয়া সন্ধ্যার পরে হোস্টেলে ফিরিয়া আসে। বিপত্নীক স্যার মৃগাঙ্ক সান্যালের সংসারে একমাত্র আকর্ষণ ও মায়ার বন্ধন এই মনীষা। কার্য্য-ব্যপদেশে শিল্পপতিকে দেশের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিতে হয়—সপ্তাহের অন্য দিনগুলিতে তিনি কলিকাতাতেও বড় বেশী থাকিতে পান না। তাই, গৃহে মনীষার একাকী থাকিতে কষ্ট হইবে বলিয়া বাধ্য হইয়াই তাহাকে হোস্টেলে রাখিতে হইয়াছে। রবিবারটা পিতা-পুত্রীর পুনর্মিলনের দিন। দোর্দণ্ডপ্রতাপ, কঠোর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্যার মৃগাঙ্ক সান্যাল এই দিনটিতে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব ভুলিয়া শিশুর ন্যায় আচরণ করেন—এক দিনের জন্য পিতা ও কন্যা নিরালায় আবার সুখের সংসার পাতিয়া বসে। মৃতদার মৃগাঙ্ক সান্যাল যেন একমাত্র সন্তান মনীষার মধ্যে তাঁহার পরলোকগতা পত্নীর স্মৃতিকে অনুভব করিতে চাহেন। সমস্ত দিনটা পরম আহ্লাদে আত্মবিস্মৃতভাবে কাটাইয়া সন্ধ্যার পরে যখন তিনি কন্যাকে গাড়িতে তুলিয়া

দিবার জন্য সদর দরজায় আসিয়া দাঁড়ান, তখন এই বয়সেও তাঁহার চোখ দুইটা ছল ছল করিয়া উঠে।

প্রতি রবিবারের মত আজও মৃগাঙ্ক সান্যালের সুপরিচিত গাড়িখানা আসিয়া হোস্টেলের দরজায় হর্ণ বাজাইতেই মনীষা উঠিয়া পড়িল। দুষ্টু মিভরা কৌতুকে রমাকে একটি চিমটি কাটিয়া মনীষা দ্রুত বাহির হইয়া গেল। গাড়িতে উঠিয়া তাহাদের বহুকালের পুরাতন ড্রাইভার রহমৎকে বলিল—"রহমৎ, আমাকে অরুণদার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে তুমি গাড়ি নিয়ে চলে যাও। বাবাকে বোলো আমি অরুণদাকে নিয়ে একটু পরেই আসছি।"

যথাসময়ে গাড়ি আসিয়া ল্যান্সডাউন রোডে পীতাম্বর চৌধুরীর বাড়ির গায়ে থামিতেই মনীষা ক্ষিপ্রপদে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল। অরুণ তাহার নিভৃত কক্ষে বসিয়া একমনে বিদেশ ভ্রমণের বিবরণ লিখিতে ব্যস্ত ছিল। মনীষার আগমন সে টের পায় নাই। দরজার চৌকাঠ ধরিয়া কয়েক মুহূর্ত মনীষা কি ভাবিল—বার দুই কাশিয়া, জুতার গোড়ালির দ্বারা ঠকঠক শব্দ করিয়া অরুণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহিল। কিন্তু অরুণ রিপোর্ট লেখায় এমনই তন্ময় হইয়াছিল যে, দরজার দিকে ফিরিয়া তাকাইল না। আগে হইলে মনীষা সোজা ঢুকিয়া গিয়া চুপিচুপি পিছন হইতে অরুণের চোখ দুইটি চাপিয়া ধরিয়া কণ্ঠস্বর বিকৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "আমি কে বল তো?"

এখন আর তাহা সম্ভবও নয়, শোভনও নয়। কাল সমস্ত

রাত্রি জাগিয়া অরুণের কথা ভাবিয়াছে—ভোর হইতেই অস্থির ভাবে ছুটিয়া আসিয়াছে। এক বৎসরের দুঃসহ বিচ্ছেদের অবসানে একান্ত প্রিয়জনকে দেখিবার ও তাহার সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা কহিবার সে কী অধীর আগ্রহ ও ব্যাকুলতা! কিন্তু ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া এখন অরুণের সম্মুখে যাইতে তাহার ভীষণ লজ্জা করিতে লাগিল। অরুণ কেন একবার দরজার দিকে তাকায় না—এমন কী লেখায় ব্যস্ত সে! কাল সন্ধ্যায় অবশ্য অরুণ তাহার সহিত দেখা করিতে হোস্টেলে গিয়াছিল, কিন্তু সেখানে যখন তাহার দেখা পায় নাই, তখন এত সহজেই সে নিরস্ত হইতে পারিল! মনীষার সহিত দেখা না করিয়া অরুণ এমন নিশ্চিন্তভাবে ঘরে বসিয়া অন্য কাজে মন বসাইতে পারিল কিভাবে! একটু আগে যেখানে ছিল দুর্নিবার আকুলতা, এখন দুর্দ্দমনীয় অভিমান আসিয়া সেখানে জাঁকিয়া বসিল। একটু আগে লজ্জায় আরক্তিম মনীষার যে সুন্দর কমনীয় মুখখানি গোপন আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, এখন তাহা রুদ্ধ অভিমানে কঠিন ও বিক্ষুব্ধ হইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

মুখ ভার করিয়া মনীষা নিকটে আসিয়া টেবিলের উপরে ছড়ানো কাগজগুলির উপরেই ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল ও অপ্রসন্নভাবে প্রশ্ন করিল, "কি লিখছিলে অরুণদা?"

যে খাতাখানিতে অরুণ তাহার ইউরোপ পর্য্যটনের সুচিন্তিত রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করিতেছিল, মনীষা নিতান্ত অবিবেচকের মত সেই খোলা খাতাটার উপরেই বসিয়া পড়িয়াছে। অরুণের

অভিনিবেশে ব্যাঘাত ঘটিল কিন্তু সে নিজেকে বিচলিত হইতে দিল না। বরং মনীষার এই প্রশ্নে অধিকতর উৎসাহিত হইয়া কহিল, "লিখছি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত—জ্যাঠামণির আদেশ। জ্যাঠ্যা-মণি বলেছেন, এ রিপোর্ট তিনি সরকারের শিল্প দপ্তরে ও পরিকল্পনা কমিশনের কাছে পেশ করবেন। এতে যে সব পরামর্শ ও সুপারিশ থাকবে তার কতগুলি আগামী শিল্পোন্ন-য়ন পরিকল্পনায় গৃহীত হবার সম্ভাবনা আছে। যদি তাই হয় তবেই না আমার এই বিদেশভ্রমণ সফল হবে। তুমি এসে ভালোই করেছ মনীষা। তুমি পাশে থাকলে আমি যেমন লেখায় উৎসাহ পাই, তেমন আর কিছুতে নয়।"

মনীষার মন বিরূপ হইয়াই ছিল, এই কথায় শান্ত হইতে চাহিল না। অভিমানে মুখ ফিরাইয়া লইয়া, হাবভাবে তেমনি কাঠিন্য বজায় রাখিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল, "তোমার কাছে আমার চেয়ে তোমার রিপোর্ট-ই বড়, তাই না অরুণদা ?"

অরুণ সহসা মনীষার এই অসঙ্গত প্রশ্ন শুনিয়া চমকিত হইল, কিন্তু পর মুহূর্তেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া আবেগভরে কহিল, "সে কি মনীষা, তুমি কি জানো না, সংসারে তোমার চেয়ে কোন কিছুই আমার কাছে বড় নয়!"

"তবে যে তুমি আমাকে দেখেও দেখছিলে না। কতক্ষণ দরজায় দাঁড়িয়ে আছি, কিছুতেই মহামুনির ধ্যানভঙ্গ হয় না!"

মনীষা টেবিল ছাড়িয়া দিয়া অরুণের চেয়ারখানার হাতলের উপরে আসিয়া বসিল, কিন্তু তখনও অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া অন্যদিকে মুখ ঘুরাইয়া রহিল।

"ও বুঝেছি! তাই এত অভিমান!" মনীষার সুডোল হাত দুই খানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া অরুণ কিছুক্ষণ আপনমনে নাড়া-চাড়া করিতে লাগিল। অনুতপ্ত হৃদয়ে ব্যথিত কণ্ঠে কহিল, "আমাকে মাফ করো, মনীষা। রিপোর্টটা নিয়ে এমনই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম যে আমি লক্ষ্যই করিনি। এই দেখ, রঘু সেই কখন চা ও খাবার রেখে গেছে—তেমনি পড়ে আছে। খাওয়ার কথা আমি ভুলেই গেছলাম। আর অভিমান নয় মনীষা, কতো কথা তোমাকে বলবার আছে—তোমার কাছ থেকে কতো কথা যে আমার শোনবার আছে—আর তুমি এসে অবধি মুখ ঘুরিয়ে বসে আছ!"

এতক্ষণে বোধ করি মনীষার মন ভিজিয়াছে। মুচকি হাসিয়া, হাতটা টানিয়া লইয়া সে উঠিয়া পড়িল ও সংগে সংগে ঠাণ্ডা চায়ের পেয়ালাটা তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

সেদিকে তাকাইয়া অরুণ ভাবিল, এই এক বৎসরে মনীষার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই। যেমন ছিল ঠিক তেমনটিই আছে। এইমাত্র অভিমানে মুখ ফিরাইয়া ছিল, কিন্তু যেই শুনিল তাহার খাওয়া হয় নাই, অমনি সমস্ত অভিমান জল হইয়া গেল—নিজের হাতে খাবার প্রস্তুত করিয়া আনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া গেল।

একটু বাদে মনীষা নিজেই এক পেয়ালা গরম ওভালটিন প্রস্তুত করিয়া আনিয়া খাবারের থালাটা আগাইয়া দিল ও নিজে আর একখানি চেয়ার টানিয়া বসিয়া কহিল, "আগে তুমি খেয়ে নাও।"

খাইতে খাইতে অরুণ তাহার বিদেশ ভ্রমণের ব্যাপক অভিজ্ঞতার বহু কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী বলিয়া গেল। মনীষা মুগ্ধ বিস্ময়ে সেই সমস্ত শুনিতে শুনিতে কখনও উৎফুল্ল, কখনও বিস্ময়াবিষ্ট, কখনও ভয়ার্ত্ত রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল।

অরুণ কেবল দেশ-বিদেশের শিল্পকারখানাই পরিদর্শন করে নাই, ইতিহাসের ছাত্র অরুণ ঐতিহাসিক স্মৃতি-সমন্বিত অতীত গৌরববাহী বহু ইতিহাস প্রসিদ্ধ নগর-নগরীও পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছে। নানাদেশের বিচিত্র মানুষের বিচিত্র প্রকৃতি ও জীবনধারা তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছে। প্রকৃতি-প্রেমিক, সংস্কৃতি ও শিল্পানুরাগী অরুণের মন যন্ত্রদানবের একঘেয়েমি হইতে ছুটি পাইলেই রম্য প্রকৃতির মধ্যে সমাহিত হইয়া থাকিত। ফ্রান্সের সেন নদী সুন্দরী প্যারী নগরীকে কণ্ঠহারের ন্যায় বেষ্টন করিয়া আছে। নদীর উপরিস্থিত সেতুর উপর দাঁড়াইয়া দেখিলে মনে হয় অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম আভা শিল্প-কলা ও সংস্কৃতির সম্রাজ্ঞী প্যারীর শোভমান ললাটে যেন সীমন্তক লেপিয়া দিয়াছে। নিশীথ সূর্য্যের দেশ নরওয়ের আবড়া-খাবড়া উপকূল-ভাগ দেখিতে ঠিক করাতের দাঁতের মত; দীর্ঘ অপ্রশস্ত সমুদ্রখাত ফিয়র্ডগুলির হরিৎবর্ণ সলিলে উচ্চ খাড়া পর্বতগাত্র ও চক্‌চকে উজ্জ্বল জলপ্রপাতগুলি প্রতিফলিত হইয়া অপরূপ নিসর্গ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে। ইউরোপের ক্রীড়াভূমি আল্পস্ পর্ব্বতমালা-বিধৃত সুইটজারল্যাণ্ডের তুষারাবৃত শৈলশৃঙ্গ, দীপ্তিমান হিমবাহ প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের বর্ণাঢ্য দৃশ্যরাজি অরুণকে বিমোহিত করিত, যেমন বিমুগ্ধ করিত মিতভাষী কায়দা-দুরস্ত নিয়মনিষ্ঠ

ইংরেজ, মিশুক উদার খোসমেজাজী ফরাসী, বলিষ্ঠ-দেহ কর্ম্মঠ ও পরিশ্রমী নরওয়েজীয়ান্, ধর্মভীরু রক্ষণশীল ইতালীয়ান। এথেন্সের অতীত গৌরবের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহার মন সুদূর অতীতে ফিরিয়া যাইত—এক্রপেলিস, পার্থিনন্, নিকস্, য়্যারিয়প্যাগাস তাহার মনে এক প্রাচীন সুসভ্যজাতির গৌরবকাহিনী স্মরণ করাইয়া দিত। আবার আধুনিককালের এথেন্স—প্যারীর ঐতিহাসিক স্মৃতি বলদর্পী নেপোলিয়নের বিজয় তোরণ, কংকর্ড ও ব্যাষ্টিল দেখিয়া ইতিহাসের এক রক্তরঞ্জিত অধ্যায় তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইত।

অরুণের বর্ণনার গুণে তাহার বিশ্বপরিক্রমার বিচিত্র বিস্ময়কর স্মৃতি মনীষারও যেন প্রত্যক্ষ বোধ হইল। কতক্ষণ অভিভূতের ন্যায় বসিয়া থাকিয়া মনীষা স্বপ্নোত্থিতের মতোই আবেশভরে কহিল, "চল, এবার উঠি। বাবা হয়তো আমাদের জন্যে ভাবছেন।"

মনীষা নিজেই অরুণের খাতা-পত্র গোছ-গাছ করিয়া দেরাজে তুলিয়া রাখিল। নীচে নামিতে নামিতে ড্রাইভারকে গাড়ি বাহির করিতে নির্দেশ দিয়া অরুণ মনীষাকে লইয়া দক্ষিণ দিকের ফুলের বাগানটায় ঢুকিয়া পড়িল। অরুণ নিজের হাতে এই উদ্যানটি রচনা করিয়াছে। নানাস্থান হইতে মনীষার পছন্দমত ফুলের গাছ আনিয়া মালঞ্চ সাজাইয়াছে। পূর্বে অরুণ ও মনীষার অনেক ধূসর সন্ধ্যা এই পুষ্পোদ্যানে অতিবাহিত হইত।

বাগানে ঢুকিবার প্রবেশ পথটি ঘন মাধবীলতায় আড়াল করিয়া

রাখিয়াছে। অরুণ বাছিয়া বাছিয়া পুষ্প চয়ন করিয়া নিজের হাতে মনীষার খোঁপায় গুজিয়া দিল ও একগোছা রজনীগন্ধার ডাঁটা তুলিয়া লইয়া দুইজনে গাড়িতে আসিয়া বসিল।

স্যার মৃগাঙ্ক সান্যাল কন্যার আগমনের অপেক্ষায় অনেকক্ষণ ব্যগ্রভাবে বসিয়া থাকিয়া শেষে নীচে নামিয়া আসিয়া লাইব্রেরী ঘরের সম্মুখের প্রশস্ত অলিন্দে অস্থিরভাবে পায়চারি করিতেছিলেন। মনীষা ও অরুণ তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করিল। অরুণ আগাইয়া আসিয়া সসঙ্কোচে আভূমি প্রণত হইয়া তাঁহার পদধূলি লইল। মনীষা কৃত্রিম ক্রোধে ও শাসনের সুরে কহিল, "তুমি কেন নীচে নেমে এসেছ বাবা; ছুটির দিনে না তোমার নড়া-চড়া, উঠা-নামা একদম বারণ!"—বলিয়াই তাঁহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

মৃগাঙ্ক সান্যাল হাসিয়া কহিলেন, "দেখলে তো অরুণ, মামণি আমায় কেমন শাসন কচ্ছে!" মনীষার কাঁধে হাত রাখিয়া কহিল, "বাপের মন তুই কি বুঝবি মা, হপ্তায় এই একটা দিনই তো তোকে আমি কাছে পাই—ভোর হতেই ছটফট করতে থাকি কতক্ষণে তোকে দেখবো।"

মৃগাঙ্ক সান্যালের কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। ইহা যে কত সত্য মনীষার চেয়ে তাহা কে বেশী জানে? তাহার স্নেহাতুর পিতা পিতৃহৃদয়ের সমস্ত মমতা ও বাৎসল্য উজাড় করিয়া দিয়া মা-হারা মেয়েটিকে একদিনের জন্যও মায়ের অভাব অনুভব করিতে দেন নাই। মনীষার ইচ্ছা হইল ছোট্ট খুকীটির

মত্ত বাপের কোলে মুখ লুকাইয়া অঝোরে কাঁদে। কিন্তু, অরুণের সম্মুখে এই দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইতে দিল না।

অভিমানের সুরে কহিল, "কেন বাজে বকছ, বাবা। তুমি তো আমাকে দেখতেই পারো না। তাইতো আমাকে তোমার কাছে রাখতে চাও না। আমায় হোস্টেলে পাঠিয়ে দিয়ে এখন বেশ নিশ্চিন্ত হয়েছ তুমি।"

অরুণ মুগ্ধ হইয়া পিতা-পুত্রীর এই ছদ্মকলহ শুনিতেছিল। মনীষা কহিল,—"বাবা, তুমি বাবুর্চ্চিকে বলে দেও, আমি আজ তোমাদের দুজনকে রান্না করে খাওয়াব।"

মৃগাঙ্ক সান্যাল অরুণের দিকে তাকাইয়া স্মিতহাস্যে কহিলেন, "তোমার ভাগ্য ভাল অরুণ, মা অন্নপূর্ণা আজ তোমাকে স্বহস্তে রান্না করে খাওয়াবেন।" অরুণ লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল।

॥ ছয় ॥

কলেজের বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। পড়াশুনার তাগিদ না থাকায় মনটা আজ অনেকটা হাল্কা বোধ হইতেছে। এতদিন রমা পরীক্ষার পড়া লইয়া ব্যস্ত থাকায় অন্য কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারে নাই। পরীক্ষার চাপ হইতে মুক্তি পাইয়া তাহার প্রথম চিন্তাই হইল অনেকদিন যাবৎ সে মায়ের কোন সংবাদ পায় নাই।

প্রায় এক মাসের উপর হইল মায়ের নিকট হইতে রমা কোন চিঠি-পত্র পাইতেছে না। পরীক্ষার ব্যস্ততার মধ্যেও সে দুইখানি পত্র দিয়াছে। কিন্তু আজও তাহার কোন উত্তর আসিল না। জানালার কাছটিতে বিমর্ষভাবে বসিয়া রমা অনেকক্ষণ চিন্তা করিল। কোন অসুখ-বিসুখ করে নাই তো! কাকা-কাকীমার যে ব্যবহার তাহাতে অসুস্থ হইয়া পড়িলে তো মায়ের অযত্নের একশেষ হইতেছে। কিন্তু তেমন কোন বড় অসুখ হইলে কাকীমা যে রকম ধূর্ত্ত নিজেই রমাকে সংবাদ দিয়া দায়িত্ব নিজেদের ঘাড় হইতে সরাইয়া দিতে চাহিতেন। এখনতো দিন কয়েক কলেজের ছুটি আছে, দেশ হইতে ঘুরিয়া আসিলে কেমন হয়। মাকে একবার দেখিতে বড় ইচ্ছা করে।

দেশে যাবার কথা মনে উঠিতেই মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই রমার মনে হইল, না, দেশে যাওয়া চলে না। রমার কলেজে পড়া লইয়া তাহাদের গাঁয়ের মধ্যে যে কদর্য্য আলোচনা সুরু হইয়াছিল, তাহা এতদিনে যদিবা একটু মন্দীভূত হইয়া আসিয়া থাকে, রমার উপস্থিতি আবার তাহাতে নূতন করিয়া ইন্ধন সংযোগ করিবে মাত্র। মায়ের অশান্তি ও লাঞ্ছনা তাহাতে আরও বাড়িয়া যাইবে। বাস্তবিক, এই কারণে রমার দেশে যাওয়াই প্রায় বন্ধ হইয়াছে। গত তিন বৎসরের মধ্যে সে আই, এ পরীক্ষা দিয়া একবার মাত্র বাড়ী গিয়াছিল—একটা রাত্রি কাটাইয়া ভোর না হইতেই আবার চলিয়া আসিয়াছে।

মায়ের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া রমার আজকাল রাত্রিতে ঘুম হয় না—তাহার জন্য মাকে যে দিনরাত কত কথাই শুনিতে হইতেছে। যেদিন হইতে রমা কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে, বিধবা ভ্রাতৃজায়ার প্রতি দেবর ও দেবরপত্নীর আক্রোশ ও দুর্ব্যবহার যেন শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করিয়াও তাহার মা বড় আশায় বুক বাঁধিয়া আছে, রমা পাশ করিয়া বাহির হইলে তাহার এ দুঃখের দিন শেষ হইবে। রমাও সেই আশাতেই দিন গণিতেছে, কবে সে একটা চাকুরী লইয়া ঘর ভাড়া করিয়া মাকে আনিয়া নিজের কাছে রাখিবে। এতো হইল ভবিষ্যতের কথা। আপাততঃ মায়ের একটা সংবাদ না পাইলে তো কিছুতেই মন সুস্থির হইতে পারিতেছে না। একটা তার করিয়া দিবে? তাহাতেই বা কি লাভ? যে অজ পাড়াগাঁয়ে

তাহাদের বাড়ি, আট-দশ ক্রোশ দূরবর্তী টেলিগ্রাফ অফিস হইতে টেলিগ্রাম পৌঁছিতে কম করিয়াও চার-পাঁচ দিন লাগিবে। বর্ষাকালে পল্লী-অঞ্চলের এক একখানি গ্রাম বা পল্লী সমুদ্রের বুকে যেন এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত—এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে, এক পাড়া হইতে অন্য পাড়ায় যাতায়াত প্রায় অসম্ভব।

রমার মনে পড়িয়া গেল, সে শুনিয়াছিল দক্ষিণেশ্বর ছাড়াইয়া বরাবর উত্তর দিকে বি টি রোড ধরিয়া কিছুটা আগাইয়া গেলে তাহার এক মাসতুতো বোনের বাসা। রমার বড় মাসীর বিবাহ তাহাদের গ্রামেই গাঙ্গুলীদের বাড়িতে হইয়াছিল—সেই মাসীরই বড় মেয়ে এই সুরমা। বয়সে রমার চেয়ে মাত্র দুই এক বৎসরের বড় হইবে। কিন্তু সুরমা এখন তিন-চারটি সন্তানের জননী। সুরমা যদি তাহার মায়ের নিকট হইতে কোন চিঠি পাইয়া থাকে, তবে হয়তো মায়ের একটা সংবাদ সেখানেও পাওয়া যাইতে পারে। রমা আর দেরী না করিয়া উঠিয়া পড়িল—আজ তো সুরমাদির নিকট খোঁজ লইয়া আসি, কাল না হয় একটা তারই করিয়া দিব। ঠিকানাটা লইয়া রমা বাহির হইয়া পড়িল।

'বাস' হইতে নামিয়া রমার ভাবনা হইল, বাসা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে তো? এতদিন পরে সুরমা তাহাকে চিনিতে পারিলে হয়। সুরমার বিবাহের পর রমার সহিত তাহার আর সাক্ষাৎ হয় নাই। ইতস্ততঃ খোঁজাখুঁজি করিয়া সুরমার স্বামীর নাম করিয়া বাসা খুঁজিয়া বাহির করিতে রমাকে খুব বেশী বেগ পাইতে হইল না। মিল এলাকায় তাহার স্বামীর

একজন সুন্দরী বাঙালী তরুণীকে সাহায্য করিতে অনেকেই অযাচিতভাবে আগাইয়া আসিয়াছিল।

বি টি রোডের গায়েই বাসাটা। পাঁকাটি ও দরমার ছাউনি-দেওয়া মাটির ঘর দেখিয়া রমা প্রথমে অবাক হইয়া গিয়াছিল। ঘরের চারিপাশ দিয়া লাউ, কুমড়া, ঝিঙে, শশার অসংখ্য লতাগাছ চালের উপর উঠিয়া ঘরখানিকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। ইহাদের আচ্ছাদন না থাকিলে বোধ করি শ্রাবণের এই ঘন বর্ষায় আত্মরক্ষা করাই অসম্ভব হইত। আশপাশে বাসাবাড়ি আর একটিও নাই—সুরমাদের ঘরখানার পরেই মিল-মজুরদের ব্যারাক পশ্চিম দিকে গঙ্গার তীর পর্য্যন্ত প্রসারিত।

ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া রমা সসঙ্কোচে ভিতরে দৃষ্টিপাত করিতেই শুনিতে পাইল, বেদনাজড়িত কণ্ঠে সুরমা তাহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছে, "এলি রমা? এতদিনে তোর সুরমাদিকে মনে পড়ল? দেখে যা বোন কি সুখে আছি।"

সাহস পাইয়া রমা লজ্জিতভাবে ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহার মুখে কোন উত্তর যোগাইল না। বাহির হইতে সুরমার অবস্থা সে কিছুটা অনুমান করিয়াছিল কিন্তু তাহা যে এত শোচনীয় ও মর্ম্মান্তিক হইতে পারে রমা তাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই। মাটির মেঝেতে চটের উপরে শুইয়া সুরমার বড় ছেলেটি উৎকট জ্বরে বেহুস হইয়া পড়িয়া আছে। মাঝে মাঝে এক একবার অস্ফুট কাতরোক্তি করিয়া তীব্র অসহনীয় যন্ত্রণা প্রকাশ করিতেছে। শিয়রে বসিয়া সুরমা শাড়ীর একটা

আঁচল ভিজাইয়া কপালে জলপটি লাগাইতেছে ও মধ্যে মধ্যে শতছিন্ন মলিন কম্বলটা টানিয়া আনিয়া ছেলেটার চিবুক পর্য্যন্ত ঢাকিয়া দিতেছে।

রমা মেঝের উপরেই স্থরমার পাশে বসিয়া পড়িয়া ছেলেটির কপালে হাত দিয়া উত্তাপ অনুভব করিল ও বোধকরি এই অস্বস্তিকর গুমট ভাবটাকে একটু তরল করিবার জন্যই কহিল, "দিদির ছেলেটি তো ভারী শান্ত—এত জ্বর, তবু কেমন চুপ করে শুয়ে আছে।"

স্থরমা কপালের জলকাপড়টা ভিজাইয়া দিতে দিতে নির্লিপ্ত উদাসীনভাবে কহিল, "সাধে কি আর চুপ করে আছে? চীৎকার করতে হলেওতো একটু শক্তি চাই—সে কি আর ওর আছে যে চেঁচাবে! আজ কুড়ি-বাইশ দিন হলো এই জ্বর। এর মধ্যে এক দাগ ওষুধও পেটে পড়েনি—পথ্য তো কেবল সাবুগোলা জল। চুপ করে না থেকে উপায় কি বোন?"

শেষের দিকে স্থরমার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিতে চাহিল। না জানিয়া রমা কি একটা কথা বলিয়া ফেলিয়া স্থরমার সবচেয়ে কোমল অনুভবশীল বেদনার্ত্ত স্থানটাতে আঘাত করিয়াছে বলিয়া নিজেকে সে বারংবার ধিক্কার দিল।

ঘরের বারান্দায় একপাশে বসিয়া স্থরমার সাত বছরের মেয়ে শৈল উনুনে আঁচ দিতেছিল। 'মা' বলিয়া ডাক দিতেই স্থরমা উঠিবার উপক্রম করিয়া রমাকে কহিল, "তুই একটু বোস রমা, আমি উনুনে ভাতের হাঁড়িটা চাপিয়ে দিয়ে আসি।"

স্থরমা উঠিয়া এক পা ফেলিতে না ফেলিতেই ঘুরপাক

খাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। রমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া সুরমাকে ধরিয়া তুলিতে যাইবে, সুরমার গায়ে হাত দিতেই সুরমার তপ্ত দেহের স্পর্শে রমার হাতে যেন ছেকা লাগিয়া গেল।

রমা সবিস্ময়ে কহিল, "একি সুরমাদি! গা যে তোমার একেবারে পুড়ে যাচ্ছে।"

সুরমা মাটির দিকে মুখ রাখিয়া আস্তে আস্তে কহিল, "ও কিছু নয় রমা, এতক্ষণ খোকার শিয়রে বসেছিলুম তাইতেই শরীরটা বোধ হয় একটু গরম ঠেকছে। বারান্দায় ঠাণ্ডা হাওয়ায় গিয়ে একটু বসলেই ও সেরে যাবে। তুই যা রমা, ততক্ষণ খোকার পাশে গিয়ে একটু বোস।"

রমা বুঝিল সুরমা এইভাবেই এতকাল আত্মপ্রতারণা করিয়া আসিয়াছে, এই অপোগণ্ড শিশুগুলিকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে—নিজের অবস্থা কাহাকেও জানিতে দেয় নাই।

মুখে কহিল, "তা হয় না সুরমাদি, আমি এখানে থাকতে এই শরীর নিয়ে কোনো কাজ তোমায় করতে দেব না। এসো, উঠে এসো। তুমি শুয়ে পড়ো। যা দরকার, আমিই সব কচ্ছি।"

রমার এইটুকু স্নেহের কথায় সুরমার চোখের জল আর বাঁধা মানিল না। আজ দশ বছর সুরমার বিবাহ হইয়াছে। নিত্য অভাবের সংসারে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া এই দশটা বছর কাটিয়াছে—অন্য দূরের কথা নিজের স্বামীর নিকট হইতেও কোনদিন এতটুকু সান্ত্বনা বা আশ্বাসের কথা শুনিতে পায় নাই।

সুরমাকে ধরিয়া আনিয়া রমা জোর করিয়াই বিছানায় শোয়াইয়া দিল। সুরমা রমার দুইটি হাত জড়াইয়া ধরিয়া করুণস্বরে কহিল, "আমার কি শুয়ে থাকলে চলে বোন? এতগুলি কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে একার সংসার, তার উপর ছেলেটার এই জ্বর। এখনই হয়তো উনি এসে খেতে চাইবেন। ভাত না পেলে একেবারে কুরুক্ষেত্র বাধাবেন—না খেয়ে যদি চলে যান, ফিরে এসে কি আমার রক্ষা রাখবেন? কি মানুষ নিয়ে যে আমি সংসার করি রমা!"

সুরমা আঁচল দিয়া চোখ মুছিল। একটু থামিয়া আবার কহিল, "এই জ্বর দেখেই তুই ঘাবড়াচ্ছিস রমা! সকালের দিকে বৃষ্টিতে ভিজে ওপাড়ায় গেছলাম। তাইতেই না হয় আজ জ্বরটা একটু বেড়েছে। তা নয়তো ঘুষঘুষে জ্বরতো আমার লেগেই আছে।"

শুনিয়া রমা শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোন সান্ত্বনার কথাই বলিতে পারিল না। সুরমা উঠিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "নে, ছেড়ে দে রমা, ভাতের ফেনটা গেলে দিয়ে আসি। শৈল কি পারবে, হাত-পা পুড়ে আবার এক কাণ্ড বাধাবে।"

"এর জন্যে তোমাকে উঠতে হবে না সুরমাদি, তুমি শোও, আমি যাচ্ছি।"—বলিয়া রমা উঠিয়া বারান্দায় গেল। নিজেই ভাতের ফেনটা গালিয়া রাখিয়া আবার সুরমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিল।

তখন সন্ধ্যা ঘোর হয় হয়। ছুটি পাইয়া শৈল দরজার বাম

ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুরমার স্বামী সুরপতি কারখানা হইতে ফিরিয়া ঘরে উঠিতে যাইবে, দরজার সুমুখে শৈলকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া হঠাৎ তাহার মাথায় যেন খুন চড়িয়া গেল।

"সন্ধ্যা-পিদিম জ্বালাসনি এখনও, এখানে দাঁড়িয়ে কি তামাসা দেখছিস?"—বলিয়া খামকা মেয়েটার গালে এক চড় বসাইয়া দিল ও কান ধরিয়া সজোরে ধাক্কা মারিয়া ভিতরে ঠেলিয়া দিল। সুরমার অস্থি-চর্ম্মসার যে ছোট ছেলে দুইটি বারান্দার অপর পার্শ্বে বসিয়া এতক্ষণ পরম পরিতৃপ্তির সহিত লাল আলু চিবাইতেছিল তাহারাও সমস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। শৈল টাল সামলাইতে না পারিয়া চৌকাঠের উপর পড়িয়া গিয়া "মাগো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

সুরপতির সাড়া পাইয়া সুরমা কাঁথা মুড়ি দিয়া নির্জীবের মত পড়িয়াছিল। মুখ বাহির করিয়া রমাকে অনুচ্চস্বরে কহিল, "দেখলি রমা? যতক্ষণ বাড়ির বাইরে থাকেন একটু শান্তিতে থাকি। বাড়ি এলেই একটা না একটা উৎপাত বাধাবেন।"

সুরপতির কাণ্ড দেখিয়া রমা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। এই ভগিনীপতিটিকে ইহার পূর্বে সে কখনও দেখে নাই। শুনিয়াছিল কোন্ এক কারখানায় দিনমজুরি করে। তা করুক, সবাই আর কারখানার ফোরম্যান কিংবা অফিসের বড়বাবু হইতে পারে না। ইতোপূর্বে সুরমার মুখে সুরপতির সম্বন্ধে যে দুই-একটা মন্তব্য শুনিয়াছিল তাহাতে ভগিনীপতির প্রতি রমার শ্রদ্ধান্বিত হইবার কথা নহে। তথাপি সুরমার কথাও

সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারে নাই। নিত্য অভাবের তাড়নায় ও ক্রমাগত ভুগিয়া ভুগিয়া সুরমার মেজাজটাও ঠিক থাকিবার কথা নহে। কিন্তু সুরপতির আবির্ভাবের সংগে সংগেই যাহা ঘটিয়া গেল তাহাতে রমার চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইতে দেরী হইল না।

রমা এক ফাঁকে মাথা তুলিয়া ভগিনীপতিটিকে দেখিয়া লইল। মাথার উপর ছোট করিয়া ছাঁটা উস্কখুস্ক চুলগুলি সজারুর কাঁটার ন্যায় খাড়া-খাড়া হইয়া আছে। ললাটের বলি রেখাগুলি অতিশয় প্রকট। গাল দুইটা বসিয়া গিয়া চোয়ালের হাড় জাগিয়া উঠিয়াছে—চোয়াড়ে মুখটাতে একটা বিশ্রী রুক্ষতা দৃষ্টিকে যেন পীড়িত করে। পরিধানের তেলচিটে পায়জামা ও হাফসার্টটা হইতে একটা ভাপসা দুর্গন্ধ ছুটিতেছে।

রমা উঠিয়া ঘরের কোনে রক্ষিত লক্ষ্মীর আসনে প্রদীপ জ্বালাইয়া সন্ধ্যারতির আয়োজনে লাগিয়া গেল।

রমার দিকে নজর পড়িতেই সুরপতি সুরমাকে উদ্দেশ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ মেয়েটি কে, চিনলাম না তো?"

সুরমা উঠিবার চেষ্টা করিল না। বিছানায় শুইয়া-শুইয়াই উত্তর করিল, "ও আমার মাসতুতো বোন রমা, কোলকাতায় হোস্টেলে থেকে কলেজে পড়ছে"

মেয়েটি কলিকাতায় হোস্টেলে থাকে, অতএব এখানে থাকিবার জন্য আসে নাই। সুরপতি আশ্বস্ত হইয়া কহিল, "তা বেশ বেশ, এতদিনে যাহোক গরীব বোন আর বোনাইকে মনে পড়েছে!"

সুরপতি কণ্ঠস্বরে সেই বিবাহরাত্রিতে বাসরঘরে শ্যালিকাদের সহিত প্রথম রহস্যালাপের মধুর আমেজটি ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিল। স্বভাবসুলভ একটা অশ্লীল রসিকতাও একেবারে জিভের ডগায় আসিয়া ঠেকিয়া গেল। প্রদীপের আলোকে সুরপতি এই প্রথম লক্ষ্য করিল যে, সুরমা নিজেও রুগ্ন ছেলেটির বিছানা আশ্রয় করিয়া শুইয়া আছে। চোখে-মুখে বিরক্তির ভাব ফুটাইয়া সুরপতি প্রশ্ন করিল, "ভর সন্ধ্যেবেলায় তুমি শুয়ে আছ যে! আবার কি হলো তোমার?"

অন্যদিন হইলে সুরপতি এই প্রশ্নটিই এমন শ্লেষ ও অবিশ্বাসের সুরে করিত যে তাহার প্রত্যেকটি কথা সুরমাকে হুল ফুটাইয়া দিত। আজ রমাকে দেখিয়াই হয়তো সুরপতি একটু ভদ্র হইবার চেষ্টা করিতেছে।

যাহাকে প্রশ্ন করা হইল সে নিরুত্তর রহিল। উত্তর করিল রমা। সে সংক্ষেপে কহিল, "দিদির আজ অনেক জ্বর উঠেছে।"

সুরপতি এবার একটু বেশ রাগতভাবেই বলিল, "এ আর নতুন কথা কি, যে ননীর শরীর তোমার দিদির—ব্যামো তো লেগেই আছে শুনতে পাই। কিন্তু কই, দুবেলা খাবার সময় তো মনে থাকে না? ছেঁদো কথায় সুরপতি ভোলে না, বুঝলে রমা? কাজ না করবার ছলাকলা আমার বুঝতে বাকী নেই। কাজ-কর্মের জন্যে ঝি-চাকর রেখে দেব, রান্নার জন্যে বামুন রেখে দেব, ছেলে বিয়োলে আয়া রেখে দেব—এমন

শর্ত্ত করেতো তোমার মেসোমশাই তাঁর মেয়ে বিয়ে দেন নি রমা?”

সুরপতির কথায় এতক্ষণ ভদ্রতার যে মুখোসটুকু ছিল তাহা খসিয়া পড়াতে সুরপতির স্বরূপ এবার প্রকাশ হইয়া পড়িল। এই লোকটির সহিত রমার আর তর্ক করিবার প্রবৃত্তি হইল না। সুরমা গায়ের কাঁথাটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইল। মনে মনে বোধ করি আর একবার শপথ করিল, যতদিন দেহে প্রাণ থাকিবে সে আর বিছানা লইবে না।

সুরপতি কাছে আসিয়া কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত কোমল করিয়া কহিল, “থাক্ থাক্, তোমার বোন যতক্ষণ রয়েছে তুমি একটু জিরিয়ে নাও।”

এই কথায় আশ্বস্ত হওয়াতো দূরের কথা, সুরপতি আবার কি মতলব আঁটিয়াছে ভাবিয়া সুরমা মনে মনে বিষম শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

নত হইয়া সুরমার কানের কাছে মুখ লইয়া সুরপতি মৃদুস্বরে কহিল, “কই দেখি, টাকা দুটো দাও তো।”

“টাকা! টাকা আমি কোথায় পাব? কোনদিন কি একটা কাণা কড়িও তুমি আমার হাতে দিয়েছ যে আজ টাকা চাইতে এসেছ?” সুরমা প্রায় চীৎকার করিয়াই কথাগুলি বলিল।

“দাও, আমাকে দেরী করিও না লক্ষ্মীটি। এক্ষুণি আবার আমাকে বেরুতে হবে।”

সুরমা কুপিত হইয়া কহিল,—“কী যা তা বলছো? যাও

আমার সুমুখ থেকে। আমার কাছে কোনদিন একটা পয়সা দেখেছো?”

সুরমার ভাগ্য ভাল, সুরপতি আজ নিজেকে সামলাইয়া লইল। কাজ হাঁসিল করিতে হইলে যে ধৈর্য্য রক্ষা করা প্রয়োজন, এই কাণ্ডজ্ঞানটুকু সে এখনও হারাইয়া ফেলে নাই।

“কেন মিছে কথা বলছো সুরমা। কেন আমাকে লুকোচ্ছ? আজ সকালে যে দুখানি থালা আর একটা ঘটি বাঁধা দিয়ে টাকা এনেছ, আমি কি তার খবর রাখিনি মনে ভেবেছ? কই বার করো দেখি আমার থালা আর ঘটি?”

সুরপতি নিজের কৃতিত্বে হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া পুনরায় কহিল, “যা হয়ে গেছে তার জন্যে তোমায় কিছু বলছি না। আজ না হয় কালতো বাঁধা দিতেই হতো। ওর থেকে শুধু টাকা চাইছি দুটো। দাও, দেরী করো না।”

সুরমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল—সহসা তাহার মুখে কোন কথা যোগাইল না। সে বজ্রাহতের মত নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিল। চক্ষের নিমেষে সুরপতি নিজেই তাকের উপরকার মাটির হাঁড়িটা উপুড় করিয়া ফেলিয়া টাকা কয়টা লইয়া বাহিরের দিকে পা বাড়াইল। মুহূর্ত্তে সুরমা যেন অসুরের শক্তি লইয়া উঠিয়া দরজায় সুরপতি পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। তাহার স্খলিত বস্ত্রাঞ্চল মাটিতে লোটাইতে লাগিল—আলুলায়িত রুক্ষ কেশরাশি পিঠের উপর ছড়াইয়া পড়িল।

সুরমা কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর একটা হাত ধরিয়া

অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া কহিল, "ওগো তোমার পায়ে পড়ি, এ টাকা ক'টা তুমি নিও না···আমার মাথা খাও, ফিরিয়ে দাও আমার টাকা ক'টা। আমি যে খোকার মুখেভাতের থালাটা বাঁধা রেখে এ টাকা এনেছি খোকাকে ডাক্তার দেখিয়ে একটু ওষুধ খাওয়াব বলে। আজ বাইশ দিন খোকার জ্বর। আমি যে ওকে এক দাগ ওষুধও খাওয়াতে পারিনিগো। দাও, ফিরিয়ে দাও আমার টাকা।"

সুরমা কাঁদিতে কাঁদিতে রমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে লাগিল, "চার-চারটে ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি খাচ্ছি না উপোস করে আছি কোনদিন তা ভ্রূক্ষেপ করেন না। আজ দুপুরে খুদকুঁড়োও ঘরে ছিল না। কারখানা থেকে ফিরে এলে পাতের সুমুখে আমি কি ধরে দিতাম। তাই, শেষ সম্বল থালা দুখানা বন্ধক দিয়ে ক'টা টাকা এনেছিলাম। সেরটাক চাল কিনে বাকী টাকা দুটো তুলে রেখেছিলাম যদি ছেলেটার জন্যে একটু ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করতে পারি। আমার পাষাণ দেবতা তাও কেড়ে নিয়ে চলেছেন।"

রুগ্ন ছেলেটা ক্ষীণস্বরে বলিল, "যেতে দাও মা, ওটাকা যখন একবার বাবার হাতে পড়েছে, তুমি আর ফিরে পাবে না। ওষুধ লাগবে না আমার, দেখো এমনিতেই আমি কেমন ভাল হয়ে উঠি।" তাহার গণ্ড বহিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু বালিশের উপর গড়াইয়া পড়িল।

রমা অপরিসীম বিস্ময়ে পাথরের ন্যায় নিশ্চল হইয়া বসিয়া ছিল। সুরপতি বেগে হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া জোর করিয়া

সুরমাকে ঠেলিয়া দিয়া বাহিরে আসিল ও একেবারে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। সুরমা উন্মত্তের ন্যায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিয়া সদর রাস্তার উপরেই দুই হাতে সুরপতির পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া রহিল।

সুরমাকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া রমাও বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। দেখিল সুরমা অবিরল ধারে অশ্রু বর্ষণ করিয়া সুরপতির দুই পা ভিজাইয়া দিতেছে এবং মর্ম্মভেদী ক্ষোভ ও দুঃখে কাতর হইয়া তাহার স্বামীকে বলিতেছে, "ওগো, কিসে তুমি এত পাষাণ হলে? আমার যে কখানা গহনা ছিল, সব তো নিয়েছ। কোন সম্বলই আমার রাখ নি। নিজের ছেলেটার উপরেও কি তোমার এতটুকু মমতা নেই? জ্বরে ভুগে ভুগে ছেলেটা ওষুধ-পথ্যের অভাবে আজ মরতে বসেছে—কোনদিন তো ফিরেও তাকাও না। ঘরের শেষ বাসন দুখানি বন্ধক দিয়ে যে দুটো টাকা আমি এনেছি ছেলেটাকে একটু ডাক্তার দেখিয়ে আনব বলে, বাপ হয়ে কোন্ প্রাণে সে টাকা দুটোও তুমি কেড়ে নিয়ে যাচ্ছ। নিয়ে চলো আমায় তোমার সেই সোহাগীর কাছে। আমি তার দাসী-বাঁদী হয়ে থাকব, তার হাতে পায়ে ধরে টাকা দুটো ভিক্ষে চেয়ে নিয়ে আসব।"

সদর রাস্তার উপর এই কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা ঘটিতে দেখিয়া কৌতূহলী জনতা একে একে আসিয়া ভিড় জমাইতে লাগিল। শঙ্কিত হইয়া সুরপতি সুরমাকে এক ঝট্‌কা মারিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া পা দুইখানি মুক্ত করিয়া দ্রুত

অদৃশ্য হইয়া গেল। সুরমা সংজ্ঞা হারাইয়া রাজপথে পড়িয়া গেল; তাহার কপালের একটা বড় অংশ কাটিয়া গিয়া দরদর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।

রমা হাটু গাড়িয়া বসিয়া তাহাকে কোলের উপর শোয়াইয়া ভাবিতে লাগিল সুরমাকে লইয়া সে এখন কি উপায় করিবে। কপালের রক্ত ধারাটাও কিছুতেই বন্ধ হইতেছে না, এই আকস্মিক আঘাতে সুরমার গা দিয়া যেন আগুন ছুটিতেছে। তাহার উপর কৌতূহলী জনতার সহস্র প্রকার প্রশ্নের সম্মুখে রমা নিজেকে বড়ই বিপন্ন মনে করিল। সুরমাকে গৃহে লইয়া যাইতে হইলেও অন্যের সাহায্য প্রয়োজন। অধিকন্তু, এই অপরিচিত স্থানে সুরমাকে গৃহে লইয়া গিয়াই বা রমা একা কি করিবে! সুরমার যে অবস্থা, সত্বর চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা না হইলে আরও কি বিপদ ঘটিবে কে জানে।

বিপদে পড়িয়াও রমার উপস্থিতবুদ্ধি একেবারে লোপ পায় নাই। রাস্তা দিয়া এই সময়ে একখানি মোটর গাড়ি আসিতে দেখিয়া রমা হাত দেখাইয়া গাড়িখানাকে থামিতে ইঙ্গিত করিল। গাড়িটা নিকটে আসিলে রমা আরোহীকে কাতর ভাবে অনুনয় করিয়া কহিল, "দেখুন, আমার এই আত্মীয়াটিকে নিয়ে আমি বড় বিপদে পড়েছি। এঁকে এখনই হাসপাতালে পাঠানো দরকার। আপনি যদি একটু সাহায্য করেন, হয়তো এঁর জীবনরক্ষা হতে পারে।"

গাড়ির আরোহী যুবকটি তৎক্ষণাৎ নামিয়া পড়িয়া সুরমাকে একাই পাঁজা করিয়া গাড়ির পিছনের সিটে শোয়াইয়া

দিল ও নিজে ড্রাইভারের পাশে বসিয়া রমার দিকে তাকাইয়া বলিল, "আপনাদের মধ্যে একজন কেউ সঙ্গে চলুন।"

রমা সঙ্কোচের সহিত কহিল, "বাড়িতেতো এখন পুরুষ-লোক কেউ নেই। আপনি এক মিনিট অপেক্ষা করুন, আমিই যাচ্ছি সংগে।" গৃহে ফিরিয়া রমা শৈলকে বুঝাইয়া অতিকষ্টে ছোট ছেলে দুইটিকে তাহার জিম্মায় রাখিয়া আসিল।

গাড়িতে উঠিয়া রমা সুরমার পাশে একটু জায়গা করিয়া বসিল। যথাসময়ে গাড়ি কলিকাতার উত্তর প্রান্তে একটি বিশিষ্ট হাসপাতালে আসিয়া থামিল। দেখা গেল হাসপাতালের চিকিৎসকদের মধ্যে গাড়ির আরোহী যুবকটির পরিচিত লোকের অভাব নাই। তাহার চেষ্টায় অবিলম্বে সুরমার প্রাথমিক চিকিৎসার পর সংগে সংগে তাহার ভর্তির ব্যবস্থাও হইয়া গেল। রমা কৃতজ্ঞচিত্তে বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া যুবকটিকে কহিল, "আপনি আমার যে উপকার করলেন শুধু ধন্যবাদ দিয়ে তার ঋণ শোধ করা যায় না। ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন।"

যুবকটি হাসিয়া কহিল, "তা তো হলো! কিন্তু, আপনি এখন কোথায় যাবেন?"

রমা চিন্তিতভাবে কহিল, "আমার বোধ হয় ওখানেই একবার ফিরে যাওয়া উচিত। আমার এই আত্মীয়াটির তিন চারটি ছেলে মেয়ে—একটির আবার ভয়ানক জ্বর। ওদের একটা ব্যবস্থা না করে এলে তো আমি নিশ্চিন্ত হতে পারবো না।"

যুবকটি কহিল, "উঠুন গাড়িতে—রাত তো এখনও খুব বেশী হয় নি, আপনাকে একেবারে পৌঁছে দিয়েই আসছি।"

রমা লজ্জিতভাবে উত্তর করিল, "আপনাকে আবার কষ্ট দেব! আপনি যা করেছেন, তার ঋণই কোনকালে শোধ হবে না।" গাড়ির একপাশে রমা কুণ্ঠিতভাবে জড়সড় হইয়া বসিল।

বি টি রোড ধরিয়া গাড়ি উত্তর দিকে বায়ুবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। হঠাৎ রমাকে বিস্মিত করিয়া দিয়া যুবকটি কহিল, "আপনাকে এর আগেও আমি দেখেছি—আপনি মনীষার বন্ধু, না?"

রমা লজ্জা ও সঙ্কোচে এতক্ষণ যুবকটিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখে নাই। মনীষার পরিচয়ে যুবকটির পানে তাকাইতেই ছয় সাত মাস আগেকার একটি হিমেল সন্ধ্যার ঘটনা তাহার স্মরণ হইল। এই কয় মাসে তাহার সহিত আর দেখা হয় নাই। কিন্তু, যুবকটির সম্বন্ধে ইতোমধ্যে অনেক কথাই রমা শুনিয়াছে। শিল্পনায়ক মৃগাঙ্ক সান্যালের যোগ্য উত্তরাধিকারী মনীষার ভাবী বর অরুণ চৌধুরী প্রায়শঃ হোস্টেলের মেয়েদের আলোচনার বিষয় হইয়া থাকে। যাহাই হউক, মনীষার পরিচয়ে রমার লজ্জা ও সঙ্কোচ অনেকটা কাটিয়া গেল।

অরুণ বলিল, "আপনাকে ওখানে ওঅবস্থায় দেখে আমি সত্যিই খুব অবাক হয়ে গেছ্‌লাম! আমি ভেবেই পাইনি, কি করে এই রাত্রিবেলা আপনি ওখানে ওভাবে থাকতে পারেন। এই মহিলাটি আপনার কে হয়, বললেন না তো?"

রমা আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বলিয়া গেল। সুরমার সহিত তাহার সম্পর্ক, সুরমার সংসারের অভাব ও দারিদ্র্য, সুরমার স্বামীর পরিচয়, তাহার সন্দেহজনক প্রকৃতি ও নিষ্ঠুর আচরণ—

মায় রমার এখানে আসার পরে যে যে ঘটনা ঘটিয়াছে সমস্তই সবিস্তারে বলিয়া গেল। বলিতে বলিতে রমার চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল। এই হৃদয়বিদারক কাহিনী শুনিয়া অরুণেরও চক্ষু দুইটি বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল।

সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া রমা কহিল, "আমার সুরমাদি আদর্শ গৃহলক্ষ্মী। স্বামীর কাছ থেকে এতটুকু সহযোগিতা পেলে সুরমাদির সংসার স্বর্গ হয়ে উঠতে পারতো। আমিও গরীবের মেয়ে, অরুণবাবু। দুঃখের সঙ্গে আমার আজন্ম পরিচয়। অভাব-দারিদ্র্য কি, আমি জানি। কিন্তু, দারিদ্র্যের এমন বীভৎসরূপ কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি। সুরমাদির দুঃখে বোধকরি পাষাণও গলে যায়।"

উদগত অশ্রু শাড়ির আঁচলে মুছিয়া রমা বলিয়া চলিল, "সুরমাদির সংসারে যে দারিদ্র্য, সেতো কেবল অভাবের দারিদ্র্য নয়। সুরমাদির স্বামী যে সামান্য মজুরি পান, তার ক'টা টাকাই বা স্ত্রী-পুত্রের জন্য আসে! ভ্রষ্ট-চরিত্রের মাশুল যোগাতেই সব নিঃশেষ হয়ে যায়। স্বামীর চরিত্রহীনতার দাম দিতে গিয়ে সুরমাদিকে উপবাসী থাকতে হয়—পুত্র-কন্যাগুলি না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরে। এতো শুধু সুরমাদির সংসারে নয়, দেশের বেশীর ভাগ মজুর শ্রমিকের ঘরের খবরই এই! প্রত্যেকটি শ্রমিকের সংগে সংগে এক একটি পরিবার অনিবার্য্য ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। পিতার উপেক্ষা ও অবহেলা সহ্য করে যে সব সন্তান-সন্ততি বেঁচে থাকে তারা হয় সমাজের বোঝা। তাদের ভার বইতে গিয়ে সমাজ পেছিয়ে পড়ে।"

একটু থামিয়া রমা পুনরায় কহিল, "বইয়ে পড়েছি, কল-কারখানার কাজের ধরন, পরিবেশ ও সে সবের তুলনায় মজুরির স্বল্পতা শ্রমিকের নৈতিক জীবনকে কলুষিত করে দেয়। কারখানার কাজে পরিশ্রম আছে, উপযুক্ত পারিশ্রমিক নেই। মালিকের শোষণ-শাসনের খাঁড়া শ্রমিকের মাথায় অনবরতই ঝুলছে, কিন্তু মালিকের কাছ থেকে এতটুকু মমতা ও সহানুভূতি তারা পায় না। কারখানার সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতিগুলি যেটুকু যত্ন পায়, কারখানার মজুর তা পায় না।"

কণ্ঠস্বরে অনেকখানি আবেগ ও জোর দিয়া রমা কহিল, "আচ্ছা অরুণবাবু, আপনারা তো কারখানার মালিক। কল-কারখানা যে মানুষকে এমন অমানুষ করে তুলছে, এর কি কোন প্রতিকার নেই? লক্ষ লক্ষ শ্রমিক তাদের স্ত্রী-পুত্র নিয়ে যে অধঃপতনের গহ্বরে নেমে যায়, তার দায়িত্ব কি আপনারা এড়াতে পারেন? আপনারা বলেন, আপনারা দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করছেন। কিন্তু, সম্পদ বাড়াতে গিয়ে দেশের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ যে মানুষ, তার প্রতি এই চরম উপেক্ষা কি দেশের অকল্যাণ-ই ডেকে আনে না? মানুষের জীবন ও মনুষ্যত্বের মূল্য দিয়ে আমরা সম্পদ চাই না অরুণবাবু।"

মোড় ঘুরিয়া গাড়িটা পূর্ব্বের স্থানটিতে আসিয়া দাঁড়াইল। রমা গাড়ি হইতে নামিয়া কহিল, "আপনি আমার জন্য অপেক্ষা করবেন না অরুণবাবু। এদিককার কাজ মিটিয়ে আমি যে কখন বেরুতে পারবো, কি আজ রাতে ফিরতেই পারবো কিনা তারও কোন নিশ্চয়তা নেই।"

দুই হাত জোড় করিয়া রমা অরুণকে নমস্কার করিয়া ও আর একবার ধন্যবাদ জানাইয়া অসংখ্য সবজিগাছে-ঘেরা মাটির ঘরখানার আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

অরুণ অভিভূতের ন্যায় অনেক্ষণ সেদিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার চক্ষের সম্মুখে এক নূতন বিচিত্র দৃশ্যের যবনিকা উঠিয়া গেল। একদিকে মালিকানার দম্ভ, পরিস্ফীত মুনাফার গগনস্পর্শী প্রাসাদ, ঐশ্বর্য্যের চোখ-ঝলসানো আড়ম্বর, আরাম ও বিলাসের সহস্র উপকরণ—আর তাহারই পার্শ্বে অসংখ্য অভাব-অনশনক্লিষ্ট শোষিত নীতিভ্রষ্ট মানুষ একটা ঘৃণিত ক্লেদাক্ত আস্তাকুঁড়ের মধ্যে পড়িয়া কিলবিল করিতেছে। জীবন নাট্যের একই অঙ্কের মধ্যে থাকিয়া এই দৃশ্য হইতে সে এতকাল চোখ ফিরাইয়া ছিল কেমন করিয়া।

॥ সাত ॥

দয়াময়ী নিজেই একবাটি গরম দুধ হাতে করিয়া আনিয়া মেহগনির টীপয়টার উপর রাখিলেন ও সবগুলি জানালা একে একে খুলিয়া দিয়া অরুণের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। এক পশলা বৃষ্টি হইয়া এখন আকাশটা বেশ পরিষ্কার হইয়াছে। অপরাহ্ণের ম্লান রোদ একখণ্ড মেঘের কবল হইতে মুক্তি পাইয়া উন্মুক্ত বাতায়নপথে ঘরের দেয়াল, পালঙ্ক ও মেঝেতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দয়াময়ী নিদ্রিত অরুণের দিকে পরিতৃপ্তির সহিত চাহিয়া রহিলেন। মমতারূপিণী মায়ের দৃষ্টি হইতে অপার বাৎসল্য বিগলিত হইয়া তাহার পীযূষধারায় সন্তানকে অভিষিক্ত করিতে লাগিল।

দয়াময়ী পরম স্নেহে অরুণের ঘন কালো চুলের মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি চালনা করিতে লাগিলেন। মায়ের অঙ্গুলিস্পর্শে অরুণের নিদ্রার ঘোর কাটিয়া গেল। দয়াময়ী ডাকিলেন, "কি রে অরুণ, উঠ্‌বিনে তুই? সকালেও উঠতে দেরী করেছিস। তোর শরীরটা কি আজ ভাল নেই?"

অরুণ লজ্জিত ভাবে উঠিয়া বসিল। প্রকাণ্ড দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকাইয়া দেখিল, চারটা বাজিতে মাত্র সাত মিনিট বাকী আছে। ছাত্রাবস্থায় দিবা-নিদ্রা তাহার সম্পূর্ণই প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল, এখনও মধ্যাহ্নভোজনের পরে সামান্য পাঁচ-দশ মিনিট বিশ্রাম করা ছাড়া দিনের বেলা অরুণ কখনই শয্যা গ্রহণ

করে না। তাই তাহাকে এতক্ষণ নিদ্রা যাইতে দেখিয়া মা স্বভাবতঃই চিন্তিত হইয়াছেন মনে করিয়া অরুণ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "শরীর ভাল থাকবে না কেন মা? এই এমনিতেই আজ একটু বেশী ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

বলিতে বলিতে অরুণ আলস্যভরে মায়ের কোলের উপরেই মাথা রাখিয়া আবার শুইয়া পড়িল। দয়াময়ী অরুণের পিঠে ও মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। অরুণ চিৎ হইয়া মায়ের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া কহিল, "আচ্ছা মা, আমার জন্য চিন্তা ভাবনা কি তোমার কোন দিনই যাবে না? ভোরবেলা উঠতে দেরী হলে, কি অবেলায় একটু ঘুমিয়ে পড়লেই তুমি অযথা চিন্তিত হয়ে পড়। আমি এখন বড় হয়েছি না? কর্মক্ষেত্রে কত ঝড়-ঝঞ্ঝা, আপদ-বিপদ আমাকে মাথা পেতে নিতে হবে। আমার জন্য এখন একটুতেই এত চিন্তিত হলে চলবে কেন মা?"

এই কথার মধ্যে গত রাত্রিতে রমার সহিত দেখা হইবার পর অরুণের মনে যে চিন্তার ঝড় উঠিয়াছিল তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত থাকিলেও দয়াময়ীর তাহা বুঝিবার কথা নহে। তথাপি কি এক অজানিত অশুভ সম্ভাবনার আশঙ্কায় মায়ের মন ব্যাকুলিত হইল। অরুণের মাথায় হাত রাখিয়া দয়াময়ী কহিলেন, "মায়ের কাছে কি ছেলে কোনদিন বড় হয় বাবা, না ছেলের জন্যে মায়ের চিন্তা কোন কালে কমে? তুই ঝড়-ঝঞ্ঝা আপদ-বিপদের কথা কেন বলছিস অরুণ? আমায় কিছু লুকোসনি বাবা, খুলে বল।"

অরুণ কহিল "ও একটা কথার কথা মা। বলছিলাম, এখন তো বড় হয়েছি, আর কতকাল আমাকে এমনি আগলে রাখবে।"

মায়ের সংগে সংগে মৃদুলাও জলের গ্লাস লইয়া ঘরে ঢুকিয়াছিল। এতক্ষণ বারান্দার রেলিং ধরিয়া পাশের বাড়ীর মেয়েটির সহিত গল্প জুড়িয়া দিয়াছিল। অরুণের কথা শেষ হইতেই পিছন ফিরিয়া উচ্চৈঃস্বরে সুর করিয়া আবৃত্তি আরম্ভ করিল,—

পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত্ত 'জননী'—তব গৃহক্রোড়ে
চিরশিশু করে আর রাখিয়োনা ধরে।

* * *

প্রাণ দিয়ে, দুঃখ দিয়ে, আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ-সাথে।
শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধ'রে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে।

খাটের সম্মুখে আসিয়া মৃদুলা চিবুক ধরিয়া মায়ের আনত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া ও নিজের দিকে ঘুরাইয়া লইয়া গম্ভীর-ভাবে কহিল, "কবি যদিও বঙ্গমাতাকে উদ্দেশ্য করে বাংলা-দেশে মায়ের আঁচল-ধরা সব ছেলেদের সম্বন্ধেই বলেছেন তবু কথাগুলো তোমার এই বুড়ো খোকাটির সম্বন্ধে যতখানি খাটে আর কারও বেলাতেই তত নয় বুঝলে মা?"

অরুণ ও দয়াময়ী মৃদুলার কথা শুনিয়া দুইজনেই হাসিয়া

উঠিল। দয়াময়ী হাসি চাপিয়া কৃত্রিম ক্রোধে মৃত্নলাকে ধমক দিয়া কহিলেন "কী যা তা বলিস মৃত্নলা! অরুণ কি আমার আঁচল-ধরা? তোর জেঠামণির অত সব কাজ-কারবার, কল-কারখানা তবে চালাচ্ছে কে? হপ্তার ছ'টা দিন তো বাছার আমার একটুও বিশ্রাম নেই। আজ ছুটির দিন কোথায় একটু বিশ্রাম করবে, না তুই এসেছিস ওর সংগে কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে।"

মাকে স্বপক্ষে পাইয়া অরুণ দুই হাতে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া আবদারের সুরে নালিশ জানাইল, "দেখলে তো মা, মৃত্নলাটা আমার সংগে খালি ঝগড়া করবে!"

মৃত্নলার দিকে তাকাইয়া তাহাকে শাসন করিবার ভঙ্গিতে কহিল, "দেখিস, মা আমাকে গৃহছাড়া করেন কি তোকেই আগে গৃহছাড়া করেন! আজই আমি অনুপমের বাবার সঙ্গে পাকাপাকি কথা কয়ে আসব। এই অঘ্রানেই ওদের বিয়েটা হয়ে যাক, কি বল মা?"

মৃত্নলা লজ্জায় আরক্তিম হইয়া মায়ের আঁচলে মুখ লুকাইল। কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্য। দাদা তাহাকে জব্দ করিয়াছে, আজ তাহারই হার হইয়াছে ভাবিয়া মৃত্নলা অরুণকে পাল্টা জব্দ করিবার জন্য ফিকির খুঁজিতে লাগিল। এই শ্রেণীর আড়া-আড়ি ও কপট রেষারেষি এই দুইটি ভ্রাতা-ভগিনীর গভীর ভালবাসার মধ্যে বৈচিত্র্য আনিয়া দেয়। মাতৃ-স্নেহের ভাগ-বাটোয়ারা লইয়া ইহাদের দুইজনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দয়াময়ী আনন্দের সহিত উপভোগ করেন।

মৃদুলা চোখে মুখে অপরিসীম উদ্বেগ ও গাম্ভীর্য্য টানিয়া আনিয়া বিস্ময়ের সুরে কহিল, "একি দাদা, তোমার কি একটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই?" কতক্ষণ ধরে তুমি মায়ের কোলের উপর শুয়ে আছো! মায়ের কোল ব্যথা হবে যে! মালিশ লাগাবার বেলা তো বুড়ো খোকাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেবার সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মায়ের কোমরে চোট লেগেছিল মনে নেই?"

সত্যই একটা গুরুতর অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে মনে করিয়া অরুণ তৎক্ষণাৎ অপ্রতিভভাবে উঠিয়া বসিল। মৃদুলা অমনি তড়াক করিয়া বিছানার উপরে উঠিয়া মায়ের শূন্য কোলের উপর ঝপ করিয়া বসিয়া পড়িল ও মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া অরুণের দিকে চাহিয়া দুষ্টামিভরা মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। পূর্ব কথার রেশ ধরিয়া মৃদুলা তর্জনী সঞ্চালন করিতে করিতে অরুণকে লক্ষ্য করিয়া আবৃত্তি করিল,—

"সংসার সমরাঙ্গণে যুদ্ধ কর দৃঢ়পণে
ভয়ে ভীত হয়ো না মানব।"

অরুণ এবার চূড়ান্তভাবে পরাজিত হইয়াছে। কিন্তু, পরাভবের গ্লানি গায়ে না মাখিয়া ভগিনীর উপস্থিত বুদ্ধির প্রখরতায় প্রাণ খুলিয়া হাসিতে লাগিল।

দয়াময়ী হাসিয়া কহিলেন, "সরে বোস্ মৃদুলা, দেখি ঠাকুর এল নাকি। তোর বাবা সন্ধ্যের পরেই খেয়ে কোথায় বেরুবেন বলেছেন।" অভিমানে ক্ষুব্ধ হইয়া মৃদুলা নত হইয়া ক্ষুণ্ণমনে পায়ের নখ খুটিতে লাগিল।

"এতক্ষণ তো দাদাকে কোলে নিয়ে বেশ সোহাগ কচ্ছিলে। যেই আমি একটু বসেছি, অমনি তোমার কাজের তাড়া পড়েছে।"

"ক্ষেপা মেয়ে আমার!" দয়াময়ী সস্নেহে মেয়ের ললাটে চুমু খাইয়া উঠিয়া পড়িলেন।

সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত রূপালী জলপ্রপাতের মতো হাস্য লাস্যময়ী মৃদুলার নিজেকে সামলাইয়া লইতে সময় লাগিল না। বিছানা হইতে নামিয়া পড়িয়া সে অরুণকে কহিল, "দাদা, তুমি তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও, আমাদের নিয়ে বেড়াতে যাবে না?

এই আমাদের শব্দটির মধ্যে অনুক্ত প্রাণীটি যে কে বুঝিতে পারিয়া অরুণের মুখের উপর আকাশে বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় একটী খুসির আমেজ দীপ্তি পাইয়া আবার মিলাইয়া গেল। গত রাত্রির বেদনা-ক্লিষ্ট স্মৃতির পাষাণভার এখনও তাহার মনে চাপিয়া বসিয়া আছে। পরশ্রমোপজীবী ধনাঢ্য নিরুদ্বেগ ভোগ-সর্ব্বস্ব জীবনের সুখ-সম্ভোগ ও আরাম-বিলাসের প্রতি তাহার মন বিমুখ ও নিস্পৃহ হইয়া আছে। কিছু সময় একা থাকিয়া নিজের মনের সহিত বোঝাপড়া করিয়া লওয়াই এখন এখন অধিক প্রয়োজন।

মনের ভাব গোপন রাখিয়া অরুণ মৃদুলাকে কহিল, "দেখছিস না, আমার শরীরটা তেমন ভালো নেই। আজ নাই বা বেরুলাম।"

মৃদুলা প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "বা রে, আমি মনীষাদিকে

ফোন করে দিয়েছি যে। তিনি এক্ষুণি এসে পড়লেন বলে। মনীষাদি আসুন, তখন দেখা যাবে তোমার অনিচ্ছা কোথায় থাকে।" মুখ টিপিয়া হাসিয়া মৃদুলা প্রস্থান করিল।

নীচের তলায় গাড়োয়ান গাড়ী পরিষ্কার করিতেছিল, হিন্দুস্থানী চাকরটা গরু দুইটাকে জাব দিতে ব্যস্ত ছিল—বাড়ীর পুরাতন ও প্রধান ভৃত্য রঘু মাঝে মাঝে হাক-ডাক করিয়া তাহারাই তদ্‌বির তদারক করিতেছিল। কিন্তু আসলে সে কলতলায় মার্জন-রত ঝি মানদার সহিত লঘু পরিহাসে সময় অতিবাহিত করিতেছিল। মনীষাকে ফটক পার হইতে দেখিয়া রঘু চকিতে মানদার সহিত কটাক্ষ বিনিময় করিয়া তৎক্ষণাৎ এক এক লাফে দুই তিনটা সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে অরুণের কক্ষে আসিয়া হাজির হইল এবং যেন কিছুই হয় নাই এইভাবে একমনে টেবিল, চেয়ার, আলনা, টীপয় প্রভৃতি যথা-নির্দ্দিষ্ট স্থানে সুশৃঙ্খলভাবে সাজাইয়া রাখিতে ও অরুণের সুট, গলাবন্ধ ও জুতা সাবধানে ঝাড়-পোঁছ করিয়া সাজাইয়া-গোছাইয়া রাখিতে লাগিয়া গেল। তথাপি এই কৃত্রিম মনোযোগের আড়ালে যে রঘু অরুণের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছে ও কি একটা কথা বলিবার জন্য উশখুশ করিতেছে, অরুণের অভ্যস্ত চক্ষু তাহা ধরিয়া ফেলিল।

"কিরে রঘু, হঠাৎ তোর এসব কাজের কথা খেয়াল হল বুঝি! সারাদিন ত এদিক মাড়াস নি।"

সে কথায় না গিয়া রঘু হিঃ হিঃ করিয়া একমুখ হাসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, "দাদাবাবু, দিদিমণি এসেছেন। ও ঘরে মা

ও মৃদুলাদির সংগে কথা কইছেন। এক্ষুণি এসে পড়লেন বলে।”

অরুণকে খুশি করিতে ও তাহার প্রসাদ লাভ করিতে যে ইহার চেয়ে উপাদেয় সংবাদ আর কিছু হইতে পারে না, পুরাতন ভৃত্য রঘু এত দিনের অভিজ্ঞতায় তাহা ঠিক বুঝিয়া লইয়াছে। ঘরের জিনিষপত্র অগোছাল ও অপরিচ্ছন্ন দেখিলে মনীষা রঘুকে আচ্ছা করিয়া বেশ দুইকথা শুনাইয়া দেয়—দিনের শেষে হঠাৎ অরুণের ঘর গোছাইবার জন্য অভিজ্ঞ রঘুর এই তৎপরতার কারণও ইহাই।

অন্যদিন অরুণ রঘুর মুখে মনীষার আগমন সংবাদ পাইলে হৃদয়-বাঞ্ছিতাকে অভ্যর্থনার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিত। আজ কিন্তু নিরুৎসাহ ভাবে পড়িয়া রহিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিল, “ওঃ, তাই বুঝি অবেলায় তোর এত কাজের তাড়া লেগে গেল। আচ্ছা, তুই এখন যা রঘু।”

রঘু খাটের খুটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া বেশ একটু অন্তরঙ্গভাবে কহিল, “ড্রাইভারকে বলি গাড়ি বার করতে।”

অরুণ তাহার এই অবাধ্যতায় ক্রুদ্ধ হইয়া ধমক দিয়া উঠিল, “এখন যা বলছি, বিরক্ত করিসনে আমাকে।”

বড়লোকের মেজাজ কখন যে কিভাবে থাকে তাহার কোন হদিস না পাইয়া রঘু মুখভার করিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই মনীষাকে টানিতে টানিতে মৃদুলা ঘরের কাছে আসিয়া দরজার বাহির হইতেই তাহাকে ভিতরে ঠেলিয়া দিল।

"দাদাকে এবার সামলাও ভাই। দাদা বলছেন, আজ আমাদের নিয়ে বেড়াতে যাবেন না। দেখো, তুমি যদি রাজী করাতে পার।" অপাঙ্গদৃষ্টিতে একবার মনীষার দিকে সকৌতুকে কটাক্ষ হানিয়া মৃদুলা সশব্দে দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

বর্ষাঋতুর সহিত প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়ের যে একটি সূক্ষ্ম যোগ আছে আমাদের কাব্যে ও কবিতায় তাহা পরিকীর্তিত হইয়াছে। আকাশে লঘুপক্ষসঞ্চারী মেঘের চটুল আনাগোনা দেখিয়া, ছাঁচতলা ও গাছের পাতায় পাতায় নৃত্যচপল বর্ষার ঝুমুর ঝুমুর নূপুরধ্বনি শুনিয়া কালীদাস কেন, প্রত্যেক বিরহ-কাতর প্রেমিক প্রেমিকার মনেই নব মেঘদূত রচিত হইতে থাকে। বর্ষাগমে প্রিয়জনের বিচ্ছেদে শুধুই ম্রিয়মাণ ও আত্মমগ্ন হইয়া না থাকিয়া বর্ষাবিধৌত শ্যামল বন-প্রান্তরের দিকে তাকাইলে প্রাবৃট প্রকৃতির যে একটি বিশিষ্ট অনুপম সৌন্দর্য্য আমাদিগকে মুগ্ধ করে তাহা গ্রীষ্মের রৌদ্রদগ্ধ তাপক্লিষ্ট, শীতের শুষ্ক বিশীর্ণ প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বর্ষাবিধৌত প্রকৃতি শুচিস্নাত তাপসীর ন্যায় নিষ্কলঙ্ক ধ্যানস্থ ও আত্মসমাহিত। কিন্তু পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি এই তাপসীর চারু দেহে তপশ্চর্য্যার রুক্ষতা নাই—চিত্তবিহ্বল-কারী অফুরন্ত সজীবতা ও প্রাণের বিস্রস্ত হিল্লোল সংযম ও আত্মনিগ্রহের শাসনে অবরুদ্ধ হইয়া আছে। প্রকৃতি-প্রেমিকের মন এই অপরাজিতা অধর্ষিতা তাপসী মূর্ত্তির সম্মুখে প্রীতি ও শ্রদ্ধার ভারে স্বতঃই অবনত হইয়া আসে।

আউট্রাম ঘাটের সম্মুখে গাড়ী রাখিয়া অরুণ, মনীষা ও মৃদুলা গঙ্গার তীর ধরিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বর্ষা-প্রকৃতির এই রমণীয় শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিল। একদিকে বারিসিঞ্চিত কচি ঘাসের মখমলে আচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর অপর দিকে গঙ্গার পশ্চিমতটবর্ত্তী বর্ষণক্লান্ত ঘনবৃক্ষশ্রেণীর অপরূপ শোভা দেখিয়া অরুণ বিমোহিত হইল।

বর্ষার শুচিস্নাত তাপসীমূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া অরুণের মানসপটে আর একটি নারীমূর্ত্তি জাগিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল তপস্বিনী বর্ষাপ্রকৃতির সহিত রমার অকলঙ্ক দেহসৌষ্ঠব ও নিগূঢ় মানসপ্রকৃতির যেন অতি নিকট সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই সাদৃশ্য কল্পনাকে আর অগ্রসর হইতে দিল না। তখনই আত্মদমন করিয়া লইয়া অরুণ আবেগভরে মনীষার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া জাহাজী কুলি, লসকর ও মাঝি-মাল্লাদের নামা-ওঠার একটি বাঁধানো ঘাটের উপর আসিয়া বসিল।

বর্ষার ভরাগঙ্গা আর তিন চারিটা সিঁড়ি অতিক্রম করিলেই কূল প্লাবিত করিয়া ছুটিবে। মেঘ দেখিয়া কলাপী যেমন আনন্দে মনোহর নৃত্য করিতে থাকে, রম্য বর্ষাপ্রকৃতির মধ্যে ছাড়া পাইয়া মনীষা উৎফুল্ল হৃদয়ে তেমনি স্বচ্ছন্দ বিহার করিতে লাগিল—কখনও মৃদুলার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া অদূরবর্ত্তী মাটির উঁচু ঢিপিটার উপর হইতে উন্মুক্ত জনশূন্য সবুজ প্রান্তরের দিকে বিস্ময়ভরা স্বপ্নময়চোখে তাকাইয়া থাকে, আবার কখনও অরুণকে টানিয়া নামাইয়া গঙ্গার গৈরিক জলে অলক্তকশোভিত

রাঙ্গা পা দুইখানি ডুবাইয়া দেয়। দুষ্টু মৃদুলা তীরে একাকী পদচারণা করিতে থাকে—ইচ্ছা করিয়াই সরিয়া গিয়া ইহাদের বিশ্রাম্ভালাভের সুযোগ করিয়া দেয়।

অরুণ অনিমিষনেত্রে মনীষার লজ্জারুণ সুন্দর মুখের পানে তাকাইয়া ছিল। ভাবিতেছিল—অনাঘ্রাত কুসুমের ন্যায় এই নিষ্পাপ উজ্জ্বল মুখের উপর বেদনার কালো ছায়া পড়িলে তাহাতে সৌন্দর্য্যহানি হইবে কিনা, ভাবিতেছিল—যে ফুল সযত্ন-রচিত উদ্যানের পরিকল্পিত ঐশ্বর্য্যের মধ্যেই অধিক শোভা পায়, তাহাকে স্থানচ্যুত করিবার মত নিষ্ঠুরতা সে কোনদিন প্রদর্শন করিতে পারিবে কিনা। মনীষা বিহ্বলভাবে আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কি দেখছ?"

অরুণ চমকিয়া উঠিল। মনীষার পল্লবের মত কোমল দুইখানি হাত বুকের কাছে টানিয়া লইয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিল, "দেখছি তোমাকে, কত সুন্দর তুমি! শিল্পী হলে, নিপুণ তুলিকায় ধরে রাখতাম এ মোহন রূপ।"

"নিজের জিনিসকে কেউ অমন করে দেখে নাকি! শিল্পী নও তুমি? তুমি মহান স্রষ্টা! আমার মধ্যে প্রেমের অনুভূতি জাগিয়েছে কে? কে আমাকে ভালবাসতে শিখিয়েছে, তুমি না?" হাত ছাড়াইয়া লইয়া মনীষা লজ্জানত সস্মিত মুখে চাঁপার কলির মত নরম বাঁ হাতের আঙ্গুলে শাড়ীর প্রান্তটা জড়াইতে লাগিল। পরম তৃপ্তিতে দুই হাতের লঘু আকর্ষণে অরুণ সাবধানে মনীষার ব্রীড়াবনত মুখখানি তুলিয়া ধরিল।

অরুণ ও মনীষা জলে আধ-ডোবা নীচের সিঁড়িটাতেই

বসিয়া পড়িল। একটা মোটর বোটের তাড়া খাইয়া ফেনিল তরঙ্গমালা সিঁড়িটার গায়ে আছাড় খাইয়া পড়িল। মনীষা সভয়ে অরুণকে জড়াইয়া ধরিল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিবার পর অরুণ কহিল "আমাদের সম্বন্ধে কারও কাছে কোনো কথা শুনেছ মনীষা ?"

মনীষা লজ্জিতভাবে হাস্যস্ফুরিত ঢল-ঢল মুখখানি অরুণের কোলের মধ্যে লুকাইয়া মৃদুস্বরে কহিল, "হাঁ শুনেছি।"

"জেঠামণি কিছু বলেছেন ?"

"না, তবে আমি বুঝতে পারি বাবাও তাই চান।"

"জেঠামণি ইচ্ছে করলে আমার চেয়ে কত বড়ো ঘরে, কত ভালো ছেলের সংগে তোমার বিয়ে দিতে পারেন।"

মুখ তুলিয়া মনীষা বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে অরুণের মুখের উপর অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ব্যথিত কণ্ঠে কহিল, "ওকথা কেন বলছ তুমি—আমার ভালো লাগেনা শুনতে। যেদিন থেকে বিয়ের কথা আমার মনে উঠেছে, তখন থেকে তোমাকেই আমি স্বামীরূপে জেনেছি। তোমার মতো বিদ্বান, প্রতিভাবান, মহান স্বামী আমার জীবনের গৌরব—আমার নারীত্বের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। আর, বড়ো ঘরের কথাইবা কেন তুলছ তুমি ? তোমাদের সংসারে তো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোনো অভাব নেই। তা ছাড়া, বাবার এই প্রচুর ঐশ্বর্য্য, দেশজোড়া শিল্প-সম্ভার সবই তো বাবা তোমাকে দেবেন।"

"দরিদ্র শ্রমিকের রক্ত ও মজ্জা শুষে নিয়ে যে বিত্ত-বিলাস, মানুষের উপর মানুষের যে নির্ম্মম প্রভুত্ব, ঐশ্বর্য্যের যে যুক্তিহীন

আড়ম্বর ও অনুচিত স্পর্দ্ধা—তা যদি আমার ভালো না লাগে, আমাকে নিয়ে কি তুমি সুখী হবে মনীষা ?"

"না গো তোমার পায়ে পড়ি, ওসব অলক্ষুণে কথা তুমি আমাকে বলো না। ভাবতে পারি না আমি।"

মনীষার সুর্ম্মাপরা পদ্মের পাপড়ির তুল্য আয়ত চোখের কোণে দুই ফোঁটা অশ্রু টলমল করিতে লাগিল। অরুণ মনীষাকে জড়াইয়া ধরিয়া বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে একখানি অবগুণ্ঠন বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে ঢাকিয়া ফেলিল।

॥ আট ॥

দেবর ও জায়ের অবিরাম দুঃসহ গঞ্জনা সহ্য করিয়াও মনোরমা তাহার স্বর্গগত স্বামীর ভিটা আশ্রয় করিয়া পড়িয়া থাকিতেই চাহিয়াছিল। কিন্তু তাহাও বুঝি আর সম্ভব হইল না। একদিকে রমা যেমন মায়ের কোন সংবাদ না পাইয়া চিন্তাকুল হইয়াছে, অপরদিকে মনোরমাও তেমনি মেয়ের কোন খবর-বার্ত্তা না পাইয়া প্রতিটি প্রহর দারুণ উৎকণ্ঠা ও উদ্‌বেগের মধ্যে অতিবাহিত করিতেছিল। শৈশবে পিতৃহীন রমা কেবল তাহার স্নেহ পুত্তলীই নয়, নিরুপায় বিধবার জীবনের একমাত্র অবলম্বন—অন্ধের নড়ি। তাই দীর্ঘদিন যাবৎ রমার চিঠিপত্র না পাইয়া মনোরমার সংশয় ব্যাকুলিত মন দিবানিশি ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটাইতেছিল।

বকেয়া খাজনার দরুণ জমিদারের কাছারিতে হরমোহনের তলব হইয়াছিল, ভোরবেলা গ্রামের মসজিদে আজান সুরু হইতেই হরমোহন উড়ুনির খুঁটে চিঁড়া-গুড় বাঁধিয়া লইয়া হাটুরেদের নৌকায় করিয়া দশক্রোশ দূরবর্তী সাহেবগঞ্জের কাছারিতে হাজিরা দিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

ভাগ্য দেবী লক্ষ্মীর আসনের সম্মুখে দণ্ডবৎ হইয়া, দরজার পাশে কুলুঙ্গিতে রক্ষিত সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্ত্তির পায়ে বার কয়েক মাথা ঠেকাইয়া হরমোহন অতি সন্তর্পণে চৌকাঠ বাঁচাইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিল, পিছন হইতে মনোরমা অতিশয় সঙ্কোচের সহিত মৃদুস্বরে ডাকিল, “ঠাকুরপো!”

কোনও বিশেষ কাজে বহির্গত হইতে হইলে সংস্কারগ্রস্ত, দুর্ব্বলচিত্ত হরমোহনের এই ভক্তির আতিশয্য নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। হরমোহন যখন কার্য্যোপলক্ষে মহকুমা শহরে যাইতেছে, তখন সেখান হইতে টেলিগ্রাম করিয়া রমার সংবাদ জানিবার এই সহজ সুযোগটুকু গ্রহণ করিবার কথাই মনোরমা কুণ্ঠিতভাবে হরমোহনকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাহিয়াছিল।

অপরিসীম বিরক্তিতে কাঁধের চাদরটা মাটিতে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া হরমোহন ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পিছন ফিরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "কি যে তোমার আক্কেল বোঠান! দেখছ আমি একটা জরুরী কাজে বার হচ্ছি, এসময়ে তোমার পেছু না ডাকলেই কি হোতো না?"

মনোরমার ব্যবহারে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ পাইলে হরমোহন তাহা কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব উচ্চে চড়াইয়া বলিত, যাহাতে ব্রজসুন্দরী শুনিতে পায়; কেননা, বোঠানের সম্বন্ধে হরমোহনের মনে যে সামান্য দরদ ও সঙ্কোচটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহার জন্য ব্রজসুন্দরী তাহাকে অহরহই তিরস্কার করিত বলিয়া ব্রজসুন্দরীকে শুনাইয়া বোঠানের দোষ-ঘাট দেখাইয়া দেওয়াকে ক্ষুদ্রবুদ্ধি হরমোহন মস্ত বাহাদুরি মনে করিত।

ব্রজসুন্দরী তখনও তক্তাপোশের উপর বাসী বিছানায় কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া বর্ষাকালীন ভোরবেলাকার ঠাণ্ডা আমেজটুকু উপভোগ করিতেছিল। স্বামী সমস্ত দিনের নিমিত্ত বাহির হইয়া যাইতেছে; কিছু খাইয়া গেল কিনা, বাড়ি ফিরিতে কত রাত্রি হইবে—এসব বিষয়ে তাহার ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। বরং, নিজের

স্বচ্ছন্দ আয়েশের যাহাতে বিন্দুমাত্র বিঘ্ন না ঘটিতে পারে, তাহার জন্যই কল্পিত অসুস্থতার অজুহাতে ঘুমের ভাণ করিয়া বেলা পর্যন্ত শুইয়াছিল। কিন্তু হরমোহনের কথা কানে যাইতেই ব্রজসুন্দরী তটস্থ হইয়া পাশের ঘুমন্ত ছেলেটাকে ঠেলা মারিয়া কাঁদাইয়া মশারির ভিতর হইতে অকস্মাৎ বাহির হইয়া আসিল।

"পেছু না ডাকলে চলবে কেন? সে আক্কেল থাকলে কি আর যার খেয়ে-পরে মানুষ, দিন-রাত তারই সর্ব্বনাশ কামনা করে? দেখছ, উনি সারাদিনের তরে বেড়িয়ে যাচ্ছেন—বকেয়া খাজনার জন্য জমিদার জরুরী তলব পাঠিয়েছে—কত আপদ-বিপদ হতে পারে—এখন পেছু না ডাকলে তোমার মনের আশ পূরবে কেন? সংসারের ঝড়-ঝঞ্ঝাতো তোমাকে কিছু পোহাতে হয় না—সব তো ঐ এক মাথার উপর দিয়েই যাচ্ছে। পরের উপর খেয়ে দিব্যি আরামে তোমার দিন কাটছে, এতেও কি আমাদের রেহাই দিতে পার না? আমাকে কচি খুকিটি পাওনি দিদি, যে আমি তোমার অভিসন্ধি কিছুই বুঝি না। নিজেরটিকে তো খেয়ে বসে আছ। আমি স্বামী নিয়ে ঘর কচ্ছি, আমার এটুকু সুখও তোমার সহ্য হচ্ছে না, তাই না? পেছু ডেকে একটা অনর্থ ঘটাতে পারলেই তোমার মনের শান্তি।" হরমোহনের কথার সূত্র ধরিয়া এইভাবে ব্রজসুন্দরী কৌশলে একঢিলে দুই পাখী মারিতে চাহিল। বৌঠানের দিক হইতে হরমোহনের মনটাকে একেবারে ফিরাইয়া আনা ও মনোরমাকে কথার বিষে জর্জ্জরিত করিয়া বাড়ি ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য করা—এই দুই কাজ হাসিল করাই ব্রজসুন্দরীর উদ্দেশ্য।

ব্রজসুন্দরীর বিষাক্ত জিহ্বার এই তীব্র হলাহল মনোরমা দাঁড়াইয়া সহ্য করিতে পারিল না। তাহার পায়ের তলায় মাটিটা যেন প্রবল বেগে কাঁপিতে আরম্ভ করিল। গা-মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। অনেক কষ্টে টাল সামলাইয়া লইয়া ঝটিকা-হত বৃক্ষের ন্যায় অবসন্ন দেহে মনোরমা বাহির হইয়া আসিল। এই সামান্য ব্যাপারেই ব্রজসুন্দরী যে এমন একটা লঙ্কাকাণ্ড বাঁধাইয়া দিবে, তাহা হরমোহনও কল্পনা করিতে পারে নাই। কতক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে পুঁটলি-বাঁধা চাদরটাকে তুলিয়া লইতে প্রবৃত্ত হইল।

মনোরমা নিজের ঘরে আসিয়া দরজায় খিল লাগাইয়া শুইয়া পড়িল। ক্ষোভ ও দুঃখে তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। যে হরমোহনকে সে আশৈশব লালন-পালন করিয়াছে সে নাকি সেই হরমোহনেরই অনিষ্ট কামনা করিবে! বিধবা হইয়াছে বলিয়াই কি সে সহোদরাতুল্যা সধবা ছোটজার স্বামী-সৌভাগ্যকে হিংসা করিবে! নারী হইয়া কেহ অন্য নারীর সম্বন্ধে এমন পৈশাচিক অপবাদ দিতে পারে! এই জঘন্য মিথ্যার ভার পৃথিবী কি সহিতে পারিবে? বাতাস হয়তো এখনই স্তব্ধ হইয়া যাইবে, গোটা আকাশটাই হয়তো একখণ্ড উল্কার মত ছুটিতে আরম্ভ করিবে। বহুদিন পরে তাহার পরম স্নেহময় স্বামীর কথা মনে করিয়া মনোরমা কাঁদিয়া ভাসাইল—এতখানি ভালবাসিয়াও কেন এই অশান্তির তপ্তকটাহের মধ্যে ফেলিয়া চলিয়া গেলে, নিজের পায়ের কাছে টানিয়া লইলে তো কোন দুঃখ ছিল না।

ব্রজসুন্দরী কিন্তু সহজে নিরস্ত হইতে চাহিল না। মনোরমার

ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া অর্গলবদ্ধ দরজার সুমুখে দাঁড়াইয়া অপেক্ষাকৃত নম্র কণ্ঠে কহিল—"ঠাকুরপোকে কি বলতে চেয়েছিলে শুনি? তোমার তো দিনরাত খালি ঐ কথা। রমাকে টেলি কর, লোক পাঠিয়ে খবর আনিয়ে দেও—অত ভনভনানি আমাদের ভালো লাগে না। কেন, কি দায়ে পড়েছি আমরা! মেয়ে যদি তার মাকে চিঠি না দেয়, কোন খোঁজ-খবর না করে, আমরা তার কি করতে পারি? তখন পই পই করে নিষেধ করেছিলুম, মেয়েকে কলেজে পাঠিও না। একা শহরে থাকলে মেয়ে বিগড়াতে কতক্ষণ! কই, তখনতো আমাদের কথায় কান দেওনি! না, মেয়ে পাশ করে মাকে সোনার পালঙ্কে বসিয়ে খাওয়াবে। হক কথা বলতে গিয়ে আমরাই তখন পর হয়েছিলুম। এখন আবার ঠাকুরপোকে কেন? ধিঙ্গী মেয়ে কোথায় কার সঙ্গে ঢলাঢলি করছে আমরা তার কি খবর রাখি! তোমার ইচ্ছে হয় নিজেই গিয়ে মেয়েকে দেখলেই পারো। আমরা পারবো না কুলের অপবাদ বয়ে আনতে, এই বলে রাখছি দিদি। এ নিয়ে তুমি আমাদের জ্বালাতন করো না।"

ব্রজসুন্দরী অপেক্ষাকৃত মোলায়েম কণ্ঠে এই যে কথাগুলি ইনাইয়া-বিনাইয়া বলিয়া গেল তাহার ফল ফলিতে বিলম্ব হইল না। রমার সম্বন্ধে সে তাহার কপোলকল্পিত যে কুৎসা প্রচার করিয়া গেল তাহাই এখন মনোরমার মনের মধ্যে তুমুল আলোড়ন উপস্থিত করিল। অনিশ্চিত আশঙ্কার ভারে তাহার বক্ষ দুরু দুরু করিতে লাগিল। রমার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় দুঃখিনী মনোরমা এতকাল যে আকাশ-প্রদীপ জ্বালিয়া

বসিয়াছিল, ব্রজসুন্দরীর এক বিষাক্ত ফুৎকারেই তাহা সম্পূর্ণ নিভিয়া যাইবার উপক্রম হইল। রমার পত্র না দিবার কারণ তো ইহাই—কলঙ্কের কালি মাখিয়া কোন মুখে সে মাকে পত্র লিখিবে? মনোরমা তাহার সংশয়-সন্ত্রস্ত চিত্তে যেন ব্রজসুন্দরীর কথারই এক অভ্রান্ত সমর্থন খুঁজিয়া পাইল। পাঁচ-সাত বৎসর পূর্ব্বে চক্রবর্ত্তী বাড়ির বিমলার সম্বন্ধেও সে ঠিক একই ধরণের কথা শুনিয়াছিল, সে কথা তো মিথ্যা হয় নাই—পোড়ামুখী বিমলা তার কলেজের কোন এক খৃষ্টান অধ্যাপককে বিবাহ করিয়া সেখানে ঘর-সংসার পাতিয়াছিল, আর দেশে ফিরিয়া আসে নাই। রমাও কি তাহাই করিবে? মনোরমা স্থির করিল সে আর দেরী না করিয়া নিজেই কলিকাতায় চলিয়া যাইবে। তাহার শেষ আশা-ভরসার স্থল একমাত্র মেয়েকে কিছুতেই বিপথগামী হইতে দিবে না—যেমন করিয়া হউক রমাকে সে ফিরাইয়া আনিবে। রমার মনে যদি সত্যই কোন কালিমা পড়িয়া থাকে, তাহা সে চোখের জলে মুছাইয়া দিবে।

রাত্রিতে হরমোহন কাছারি বাড়ী হইতে ফিরিয়া রসুই ঘরের বারান্দায় খাইতে বসিয়াছিল। ভোরবেলায় তাহার একটা অসতর্ক কথার জন্য যে বৌঠানকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হইয়াছে সে কথা স্মরণ করিয়া হরমোহন একেবারে থালার উপর ঝুঁকিয়া নিঃশব্দে এক একটি গ্রাস মুখে পুড়িতেছিল। মনোরমা বাঁ-হাত দিয়া কেরোসিনের ডিবাটা হরমোহনের দিকে একটু আগাইয়া দিয়া কম্পিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কাছারিবাড়ি

গেছলে ? জমিদার কেন ডেকে পাঠিয়েছিলেন? কাজ কিছু হলো ঠাকুরপো ?"

কিছু একটা বলিবার জন্যই হরমোহনের প্রাণটা আনচান করিতেছিল। সে খুশী হইয়া বলিল, "হ্যাঁ বোঠান, কাজ হয়েছে বই কি—একেবারে আশাতীত হয়েছে। জমিদারের যে নতুন ম্যানেজারটি এসেছেন উনি নাকি দাদার সঙ্গে এক কলেজে পড়তেন। দাদার পরিচয় পেয়ে তখনই জমিদার বাবুকে বলে দু'বছরের খাজনা মকুফ করে দিলেন।"

একটু থামিয়া হরমোহন সিক্তকণ্ঠে কহিল, "দাদার জন্যেই লোকের কাছে যা একটু খাতির-যত্ন পাই, নইলে এই মুর্খ হরমোহনকে কে পোছে বোঠান।" হরমোহন সজল চক্ষু দুইটি তুলিয়া বোঠানের মুখের উপর স্থাপন করিল, কিন্তু সে মুখে বেদনাক্লিষ্ট থমথমে ভাব দেখিয়া চিন্তিতভাবে আবার আহারে মনোনিবেশ করিল। মনোরমা উঠিয়া শূন্যপ্রায় থালার উপর দুইহাতা উষ্ণ ভাত ঢালিয়া দিল।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে কাটিবার পর মনোরমা কহিল, "ঠাকুর-পো, কালই আমি কোলকাতা যেতে চাই। তুমি না নিয়ে যেতে পারো, একজন লোক ঠিক করে দেও।"

বৌঠানকে বাড়ি ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য করিবার জন্য ব্রজসুন্দরীর সহিত হরমোহন নিজেও চেষ্টার কসুর করে নাই, কিন্তু বৌঠানের মুখে অকস্মাৎ এই অভাবনীয় প্রস্তাব শুনিয়া হরমোহন যথার্থই মর্ম্মাহত হইল। তথাপি এই বিষয়ে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা তাহার ছিল না—বৌঠানকে

তাহার সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিলে ব্রজসুন্দরী তাহাকে অকথ্য গালিগালাজ করিবে। হরমোহন ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন-ব্যঞ্জনটুকু একপাশে সরাইয়া রাখিয়া বিষণ্ণ ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে উঠিয়া আচমন করিতে গেল।

ব্রজসুন্দরী কোলের ছেলেটাকে ঘুম পাড়াইবার অছিলায় নিজেই ভোঁস ভোঁস করিয়া ঘুমাইতেছিল। ছেলেটা বুকের উপর চড়িয়া দুর্নিবার কৌতূহলে ব্রজসুন্দরীর বিস্ফারিত নাসারন্ধ্রে গুটিকয়েক অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া প্রাণপণে নাসিকা গর্জন বন্ধ করিবার জন্য কসরত করিতেছিল। নিদ্রিত পত্নীকে ঠেলা মারিয়া জাগাইয়া হরমোহন কহিল, "বোঠান যে কালই কোলকাতা যেতে চাইছেন?"

ব্রজসুন্দরী দুরন্ত ছেলেটাকে জোর করিয়া শোয়াইয়া দিয়া পাশ ফিরিয়া কহিল, "যেতে চাচ্ছে যাক, ভালোই তো, তুমি আবার কিছু বলতে যেও না—একটা কিছু ভালো মন্দ ঘটলে তখন তোমাকেই কথা শুনতে হবে।"

ব্রজসুন্দরীর কথা শেষ না হইতেই হরমোহন কহিল, "তাতো হলো, কিন্তু কোলকাতায় গিয়ে বোঠান থাকবেন কোথায়, রমার হোষ্টেলে তো আর তিনি গিয়ে থাকতে পারবেন না!"

ব্রজসুন্দরী সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁজি মারিয়া কহিল—"তা নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না। কেন, কোলকাতায় কি তার কেউ নাই নাকি? দরকার হ'লে তার বোনঝি সুরমার বাসাতেই গিয়ে উঠতে পারবে।" ধমক খাইয়া হরমোহন চুপ করিয়া গেল, কিন্তু কেমন একটা অস্বস্তি তাহার বুকে চাপিয়া রহিল।

পরদিন সকালেই মনোরমা প্রস্তুত হইয়া লইল। ছোট্ট একটি পুরাতন তোরঙ্গের মধ্যে খানকয়েক নিজের ব্যবহারের কাপড়-চোপর ছাড়া সে সংসারের একটি জিনিষও সঙ্গে লইল না। এমন কি নিতান্ত প্রয়োজন পড়িতে পারে বলিয়া নিরামিষ আহারের সামান্য থালা-বাটি ছু'খানাও গ্রহণ করিল না। তাকের উপর হইতে বিরাজমোহনের শেষ বয়সের প্রতিকৃতিখানি সাবধানে নামাইয়া তাহা বস্ত্রাঞ্চলে মুছিয়া ভক্তিভরে তোরঙ্গের মধ্যে একখানি পরিষ্কার কাপরের ভাঁজের মধ্যে রাখিয়া দিল।

মনোরমার বোনপো স্থরমার ভাই মৃত্যুঞ্জয় আসিয়া হাঁক দিতেই মনোরমা বাহির হইয়া আসিল। আঙ্গিনায় তুলসীতলায় প্রণাম সারিয়া ব্রজসুন্দরীর ছেলেটাকে কোলে তুলিয়া একটু আদর-সোহাগ করিল ও ছেলেটাকে ব্রজসুন্দরীর নিকট রাখিয়া মনোরমা বহির্বাটির দিকে পা বাড়াইল। ব্রজসুন্দরী চক্ষু ছুইটি আঁচলে মুছিয়া কৃত্রিম সমবেদনার সুরে কহিল, "সাত নয় পাঁচ নয়, পেটের ঐ তো একটিমাত্র মেয়ে—বিদেশ বিভুঁয়ে একা পড়ে আছে। ভাল-মন্দের কথাতো কেউ বলতে পারে না। সত্যই তো, মেয়ের কোন খবরবার্ত্তা না পেলে কোন্ মা নিশ্চিন্ত বসে থাকতে পারে! যাবেই যখন, আমরা তোমাকে বারণ করে মনে দুঃখ দিতে চাই না দিদি।"

এইভাবে লাহিড়ীদের বড় গিন্নী শশুরের ভিটা ছাড়িয়া চলিল। তাহাকে বিদায় দিতে কাহারও চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিল না। কেবল সেদিন সকাল হইতে হরমোহনকে আশে-পাশে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

গাঙ্গুলীবাড়ির পিছন দিয়া একটা সরু নালা বাহির হইয়া গ্রামের প্রান্তে সাহেবগঞ্জের খালের সহিত মিশিয়াছে। কার্ত্তিক-অঘ্রানে এই নালাটি সম্পূর্ণ শুকাইয়া যায়, কিন্তু এখন ভরা-বর্ষায় নালার জল দুই তীর উপচাইয়া পড়িতেছে। গাঙ্গুলিদের বাড়ির ঘাটে একটা প্রাচীন বটগাছের ঝুরির সহিত গফুর মাঝির একমাল্লাই নৌকাটা বাঁধা ছিল। সুরমার মা ও ছোট একটি ভাই মনোরমাকে বিদায় দিতে আসিয়াছিল। সুরমার এই ভাইটি ছেলেবেলা হইতেই মনোরমার বড় বাধুক ছিল। দশ-বার বছর বয়সে এখন সে-ই মাসীর তত্ত্ব-তালাস করিত।

নৌকাঘাটে সুরমার মা মনোরমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কম্পিত-স্বরে কহিল,—"তুই আমাকে একা ফেলে চললি মনো। আপদে-বিপদে দুজনে কাছে থাকবো বলে বাবা আমাদের দুই বোনকে একই গাঁয়ে বিয়ে দিয়েছিলেন।" ষাট বছরের বৃদ্ধা নীরবালা বার বার আঁচলে চক্ষু মুছিতে লাগিল।

মনোরমা কহিল,—"তুমি তো একা নও দিদি। মৃত্যুঞ্জয়, রথীন আছে—বেঁচে থাক বাছারা আমার—ওরাই তোমাকে করে-কম্মে খাওয়াবে। উনি গত হয়েছেন পর, তুমিই তো ছিলে আমার বড় আশ্রয়। তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার কি কম কষ্ট হচ্ছে। কি করি বলো, পেটের মেয়ে—সেই তো হলো যত অনর্থের মূল। কেন যে মেয়েটাকে রেখে নিজেই স্বর্গে গেলেন, যাঁর জিনিষ তিনি সংগে নিয়ে গেলেও এর চেয়ে শান্তিতে থাকতে পেতুম।"

পরলোকগত স্বামী বিরাজমোহনের কথা উঠিয়া পড়াতে মনোরমার দুইচোখ দিয়া শ্রাবণের ধারা নামিয়া আসিল। নীরবালা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া শেষে কহিল, "আমি দিন-রাত ভগবানকে বলি আর জন্মে যেন মেয়ে পেটে ধরতে না হয়। দেখছিস্ তো একা সুরমার জন্যেই দিন রাত আমি কেমন জ্বলে পুড়ে মরছি। আমি দুঃখ পাব বলে সুরমা আমাকে কোন কথাই জানতে দেয় না। একটা পাঁড় মাতালের হাতে পড়ে কি যে কষ্ট মেয়েটার, ভাবলে স্থির থাকতে পারি না। অমন কুলিনের হাতে দেয়ার চেয়ে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া ছিল ঢের ভালো।"

নীরবালা কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইল। মনোরমার হাত দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল,—"মৃত্যুঞ্জয়তো তোকে রেখেই চলে আসবে; কিন্তু তুই তো ওখানেই রইলি মনো, মেয়েটার একটু খোঁজ-খবর করিস। সেদিন হারাণের মুখে শুনলাম সুরমার নাকি কঠিন ব্যামো। আরো যে কত কি মেয়েটার অদৃষ্টে আছে!"

রথীনকে কাছে টানিয়া মনোরমা তাহার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইতে লাগিল। বাষ্পাকুল চোখ দুইটি আঁচলে মুছিয়া নারবালা আবার কহিল, "হ্যাঁরে মনো, কোথায় গিয়ে উঠবি? রমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিস তো যে তোরা আজই রওনা হচ্ছিস। ইষ্টিশানে লোক পাঠাতে লিখেছিস?"

মনোরমা চিন্তিতভাবে কহিল, "চিঠিতো দিয়েছি, কিন্তু মেয়েটা যে কোথায় আছে কিছুই তো আমি জানিনে দিদি।

সে তো আমার কোন চিঠিরই জবাব দেয় না। এই সেদিনও রথীনকে দিয়ে একটা চিঠি ডাকে ফেলেছি।"

মনোরমার কথা শেষ না হইতেই রথীন বলিয়া উঠিল—"তোমার চিঠি তো আমি ডাকে দিইনি মাসী!" কথাটা মনোরমার তেমন কানে গেল না—সে নীচু হইয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পদধূলি লইতেছিল। সুরমার মা-ই জানিতে চাহিল, "তবে কি করেছিস হতভাগা?"

এই কথার মধ্যে যে কোন গূঢ়রহস্য থাকিতে পারে বালক রথীনের তাহা বোধগম্য হইবার কথা নহে। সে অকপটে বলিয়া গেল, "সে চিঠি তো আমার হাত থেকে ব্রজমাসী নিয়ে গেল। বললে, তোর মেসো এখনই বেরুবে, সে-ই ডাকবাক্সে ফেলে দেবে'খন। আমার হাতে একটা আনি গুজে দিয়ে বললে, তুই রামকানাইয়ের দোকান থেকে একটা ঘুড়ি কিনে নিস রথী।" মনোরমা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, "আগের চিঠিটা?—সোমবার দিন যেটা তোকে ডাকে ফেলতে দিলুম।"

"সেটাতো আমার হাত থেকে নিয়ে ব্রজমাসী নিজেই ডাকে পাঠিয়ে দিলে।" মনোরমা নির্নিমেষ নেত্রে তাকাইয়া রহিল—তাহার মুখ দিয়া কোন কথা সরিল না। সুরমার মা ছেলেকে তিরস্কার করিয়া কহিল, "তবেই হয়েছে বোকা ছেলে! আমাকে বলবি তো?"

যেন একটা গুপ্ত রহস্যের সন্ধান মিলিয়াছে, এইভাবে পরম পরিতৃপ্তির সহিত ঘাড় নাড়িয়া নীরবালা বলিল, "তাইতো বলি—একটা কিছু না হলে চিঠি দেবে না এমন মেয়ে তো

আমাদের রমা নয়। তখন বলিনি মনো, যে এসব ঐ রাক্ষসী ব্রজসুন্দরীর কারসাজি।”

গফুর মাঝি হাঁক দিল, “আর দেরী করবেন না মাঠান, উজান ঠেলে বেলাবেলি ইষ্টিসানে পৌছুতে পারবো না তা হলে।”

জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পদ ধূলি লইয়া মনোরমা শশব্যস্তে গিয়া নৌকায় উঠিল। মৃত্যুঞ্জয় আগেই উঠিয়া বসিয়াছিল। গফুর নৌকার বাঁধনটা খুলিয়া দিয়া একটা ঠেলা মারিয়া নৌকাটাকে স্রোতের মুখে আগাইয়া দিয়া নিজে এক লাফে উঠিয়া বসিল। উজান বহিয়া নৌকাটা ছলাৎ ছলাৎ শব্দে মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। মনোরমা ভাবিতেছিল, তবে কি ব্রজসুন্দরী সে চিঠি ডাকে পাঠায় নাই, ইহাতে তাহার কি স্বার্থ থাকিতে পারে! হঠাৎ বহুদূরাগত একটা অস্পষ্ট 'বোঠান' শব্দে চমকিত হইয়া মনোরমা দেখিল—হরমোহন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে নৌকাঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অপস্রিয়মান নৌকাখানিকে দৃষ্টির সীমার মধ্যে ধরিয়া রাখিবার জন্য হরমোহন বট গাছের উচু শিকড়গুলির উপর উঠিয়া মোটা গুঁড়িটায় হেলান দিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সময় নৌকাটা একটা ঘন আখ-ক্ষেতের আড়ালে পড়িয়া যাওয়ায় হরমোহনকে আর দেখা গেল না।

সাহেবগঞ্জের খালের মুখে আসিয়া নালাটা বেশ খানিকটা চওড়া হইয়াছে। পারা-পারের জন্য নালার উপর দিয়া একটা বাঁশের লম্বা সাঁকো। ডাকহরকরা তারিণী একহাতে এক

তাড়া চিঠি ও অন্যহাতে একটা ছাতা লইয়া সাঁকো পার হইতেছিল। বিরাজমোহনের জীবিতকালে তারিণী কিছুকাল লাহিড়ী-বাড়িতে গোমস্তাগিরি করিয়াছিল। সেই হইতে লাহিড়ী-পরিবারের সহিত তারিণীর যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। মৃত্যুঞ্জয়কে দেখিয়া তারিণী প্রশ্ন করিল, "মাঠানকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ মৃত্যুঞ্জয় ?"

মনোরমা ঘোমটা টানিয়া ছইয়ের ভিতরে সরিয়া বসিল। মৃত্যুঞ্জয় কহিল,—"যাচ্ছি কোলকাতায়। অনেকদিন রমার কোন চিঠিপত্র না পেয়ে মাসী বড় উতলা হয়ে পড়েছেন তারিণী কাকা।" তারিণী অবাক হইয়া কহিল, "বলিস কি মৃত্যুঞ্জয়, এই সেদিনও তো রমার একখানা চিঠি আমি ছোট্‌ঠানের হাতে দিয়ে এলুম।"

মনোরমার আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে সমস্তই ব্রজসুন্দরীর কারসাজি। তাহাকে বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য করিবার জন্যই ব্রজসুন্দরী এই ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করিয়াছিল। মনোরমা এতক্ষণ কাঁদে নাই, কিন্তু এইবারে তাহার দুই চোখে বর্ষার বারিধারা নামিয়া আসিল।

মাথার উপর দিয়া একটা প্রকাণ্ড গাংচিল উড়িয়া যাওয়াতে ডানার ঝাপটায় ভয় খাইয়া একটা ডাহুক প্রাণভয়ে কোঁ কোঁ শব্দে পাটখেতের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। গফুর মাঝি সুদক্ষ হাতে লগি ছাড়িয়া বইঠা তুলিয়া লইল।

॥ নয় ॥

মনোরমা ও মৃত্যুঞ্জয়কে লইয়া শিল্পপতি স্যার মৃগাঙ্ক সান্ন্যালের নয়নাভিরাম অতিকায় গাড়ীখানা জগত্তারিণী হোষ্টেলের গাড়ি বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইতেই মনীষা সসম্ভ্রমে মনোরমার পদধূলি লইল। মৃত্যুঞ্জয়কে বহিরাগত পুরুষ দর্শনার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া মনীষা মনোরমাকে সঙ্গে করিয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল ও স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল দিয়া সযত্নে মেঝে পরিষ্কার করিয়া একখানি ধৌত সুদৃশ্য মাদুর পাতিয়া তাহাকে বসিতে দিল।

মনোরমা এই অপরিচিতা মেয়েটির দ্বিধা-সঙ্কোচহীন ব্যবহার এতক্ষণ অবাক হইয়া লক্ষ্য করিতেছিল। হাওড়া ষ্টেশনে অপ্রত্যাশিতভাবে তাহাদের জন্য একখানি প্রকাণ্ড গাড়ি অপেক্ষা করিতে দেখিয়া মনোরমা বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। তারপরে হোষ্টেলে পৌঁছিয়া এই সম্পূর্ণ অপরিচিত মেয়েটির আদর-আপ্যায়নে একদিকে যেমন তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না, অপরদিকে তেমনি তাহার মনে কেমন একটা সংশয় ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল। মেয়েটি প্রথম হইতেই যেভাবে সহজ স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিকতার সহিত মনোরমার কখন কি প্রয়োজন হইতে পারে প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় স্বচ্ছন্দভাবে প্রশ্ন করিয়া করিয়া জানিয়া লইতেছিল—একালের কোন উচ্চ-শিক্ষিতা শহুরে মেয়ে একজন পাড়াগেঁয়ে ধর্মভীরু ও রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রাচীনা বিধবার আচার-বিচার সম্বন্ধে যে

এতখানি অবহিত হইতে পারে, ইহা পূর্বে মনোরমা হয়তো বিশ্বাসই করিত না। বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া যেভাবে গঙ্গাজলে গৃহ মার্জনা করিয়া মনোরমার আহ্নিকের ঠাঁই করিয়া দিল ও প্রতিটি তুচ্ছ উপকরণ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া আনিল, তাহাতে মনোরমা এই নব্যশিক্ষিতা মেয়েটির ভক্তি-বিনম্র ব্যবহারের পরিচয় পাইয়া রীতিমত মুগ্ধ হইয়া উঠিল। কিন্তু মনোরমার কেবলই মনে হইতে লাগিল, কোথায় যেন একটা গুরুতর ভুল রহিয়া গেছে, নয়তো মেয়েটি একবার তাহাদের পরিচয় জানিতে চাহিল না পর্য্যন্ত। আহ্নিক শেষ হইলে মনীষা যখন শ্বেত-পাথরের গ্লাসে করিয়া নিজহস্তে এক গ্লাস ফলের রস প্রস্তুত করিয়া আনিয়া মনোরমার সম্মুখে রাখিল ও নিজে অনাচ্ছাদিত মেঝের উপর না ঠিক পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল, তখন আর মনোরমা তাহার বিস্ময় চাপিয়া রাখিতে পারিল না।

"তোমার এমন মিষ্টি ব্যবহার, মনে হয় যেন আমাদের কতকালের পরিচয়! কিন্তু আমরা কে, কোত্থেকে আসছি, তুমি তো জানতে চাইলে না; কি, তোমার নিজের পরিচয়ও তো আমায় জানাও নি মা।" মৃদু হাসিয়া মনোরমা সকৌতুকে প্রশ্ন করিল।

"মাকে কি কাউকে চিনিয়ে দিতে হয়? মায়ের পরিচয়, মায়ের রূপ যে কতদিন ধরে আমার মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে।" মনীষা লজ্জায় অধোবদন হইয়া ধীরে ধীরে কথা-কয়টি উচ্চারণ করিল।

মনোরমা অবাক হইয়া শুনিতেছিল। তাহার মাতৃ-

হৃদয়ের অপার বাৎসল্য বিগলিত হইয়া এই অজানা-অচেনা লজ্জাবনতমুখী মেয়েটিকে অভিসিঞ্চিত করিতে লাগিল।

মনীষা বলিতে লাগিল, "রমা আমার বন্ধু। আমরা দু'জনে একসঙ্গে পড়ি ও একই ঘরে থাকি। কাল ভোরে রমা তার এক মাসতুতো বোনের বাসায় গেছে। সেখান থেকে সোজা কলেজ করে আজ বিকেলে হোস্টেলে ফিরবে। কলেজ ছুটির সময় হয়ে এলো, রমা এক্ষুণি এসে পড়বে।"

"তুমি কলেজে যাওনি?" মনোরমা সবিস্ময়ে জানিতে চাহিল।

"কাল যখন আপনার চিঠিটা পেলাম, তখন তো রমা এখানে ছিল না। তাই সব ব্যবস্থা আমাকেই করতে হয়েছে। রমা না থাকাতে আপনার হয়তো অনেক অসুবিধেই হলো, কিন্তু মায়ের সেবার ভার আমিই প্রথমে পেলাম, এইটেই আমার সবচেয়ে বড় গৌরব।"

মনোরমা আর স্থির থাকিতে পারিল না। পরম আদরে মনীষাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। তাহার দুই চোখ দিয়া দুই ফোঁটা আনন্দাশ্রু মনীষার সুডোল ললাটের উপরে পড়িয়া তাহাকে চমকাইয়া দিল। স্নেহসিক্ত কণ্ঠে মনোরমা শুধু বলিল, —"তোমার মত লক্ষ্মী মেয়ে পেয়েছি, আজ আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন। আমি অন্য কোথাও এসেছি, কি রমা এখানে উপস্থিত নেই—এতো তুমি আমাকে এক মুহূর্তের জন্যেও বুঝতে দাওনি।"

মনোরমার কথা শেষ হইতে না হইতেই রমা ঘরে ঢুকিয়া যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। হারানো

ছেলেকে অকস্মাৎ ফিরিয়া পাইলে মা যেমন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া অবিরলধারে অশ্রু বর্ষণ করিতে থাকে—তাহার মুখ দিয়া বাক্যস্ফুরণ হয় না, বহুদিন পরে রমাকে দেখিয়া মনোরমার অবস্থাও হইল ঠিক তেমনি। মনোরমা বহুক্ষণ নিঃশব্দে ও বাষ্পাকুল নির্নিমেষ নেত্রে রমার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। অশ্রুসজল চোখের সস্নেহ দৃষ্টি দিয়া বুভুক্ষিত মাতৃ-হৃদয় সন্তানকে যেন আকণ্ঠ পান করিতে লাগিল।

বিস্ময়ের ঘোরটা কাটিয়া গেলে রমা বই-খাতা বিছানার উপরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া অপরিসীম আনন্দে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিল। ক্ষণকাল পরে কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিয়া—আসিতে পথে কষ্ট হইয়াছে কিনা, হাওড়া ষ্টেশন হইতে হোষ্টেলে আসিয়াছে কিভাবে, হোষ্টেল খুঁজিয়া বাহির করিতে বেগ পাইতে হইয়াছে কিনা, এখানে আসিয়া কি কি অসুবিধা হইয়াছে, ইত্যাদি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া মাকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিল।

মনোরমা বাধা দিয়া কহিল, "তুই ভাবিসনি রমা। এই মেয়েটির জন্মে আমার কোথাও এতটুকু অসুবিধা হয়নি। মনীষা আমার যে যত্ন করেছে, তুই থাকলেও তা পারতিস না।"

মাতৃসন্দর্শনের আনন্দে রমা এমনই বিহ্বল হইয়াছিল যে মনীষার দিকে তেমনভাবে তাকাইয়া দেখে নাই। এখন মায়ের কথায় তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই রমা কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করিয়া কহিল, "ও, তাই আজ সাধ করে কলেজ যাওয়া হয়নি। কলেজ ফাঁকি দিয়ে দিব্যি মায়ের সোহাগ খাওয়া হচ্ছে।"

মনীষাও সংগে সংগে জবাব দিল, "হ্যাঁ, তাই বই কি। মায়ের জন্যে কলেজ ফাঁকি দিতে হয় আমি একশবার দেব, তোর তাতে কি।" মায়ের মুখের পানে তাকাইয়া অভিমানের সুরে কহিল, "শুনলে মা, রমার কথা! ও থাকলে জানতেই দিত না যে তুমি আসছ। মায়ের জন্যে আমার যা খুশী, আমার যেটুকু সাধ্য আমি করব, তাতে ওর এত আপত্তি কেন বলতো মা?"

মনীষার ঘন কালো চুলের মধ্যে সস্নেহে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে মনোরমা ব্যথিত হইয়া কহিল, "তুমি ঠিকই বলেছ মা। রমা যখন এক বছরের শিশু তখন ওর বাবা মারা যান। সেই থেকে বড় দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়েই আমি ওকে মানুষ করেছি। তাই একটুতেই প্রাণে বড় আঘাত পায়। রমা আমাকে গরিবানাভাবে রাখবে, তবু নিজের সাধ্যে না কুলালে কারও সাহায্য নিয়ে আমাকে অকারণ বিলাস ও সচ্ছলতার মধ্যে রাখবে না। আমিও তা চাই না মা। এনিয়ে তুমি কোন দুঃখ করো না।"

মায়ের মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া রমা কহিল, "তুমি না চাইলেই তো হবে না—তোমার বড়লোক মেয়ে যদি চায় তোমাকে শুনতেই হবে মা। এখন তো তুমি আর দরিদ্র পরিবারের বউ কিংবা গরীব রমার মা-ই নও।"

মনীষা লজ্জায় অধোবদন হইয়া ছিল। রমা একবার আড়চোখে সেদিকে তাকাইয়া মাকে কহিল, "এই মনীষাইতো তোমাকে এ্যাদ্দিন আমার নাম করে মাসে মাসে তিরিশ টাকা মাস-হারা পাঠাতো।"

কৃতজ্ঞতায় মনোরমার চোখে জল আসিয়া পড়িল। আবেগভরে মনীষাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া মনোরমা কহিল, "মনীষার মতো যার মেয়ে, তার আবার দুঃখ কিসের? তোমরা দু'বোনে মিলে তোমাদের যেভাবে ইচ্ছা আমাকে রেখো—আমি পরমসুখে থাকবো।"

মায়ের মুখের এই আশ্বাসের কথায় মনীষা সাহস পাইয়া কহিল, "সে হবে না মা। রমার কাছে আমি তোমাকে কিছুতেই থাকতে দেব না। মেয়ের গৌরব যখন দিয়েছ, এই ছোট মেয়ের কাছেই তোমাকে থাকতে হবে।"

মনোরমা তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "থাকবো বই কি মা, আমার ছোট মেয়ের কাছেই আমি থাকব।" একটু থামিয়া কি চিন্তা করিয়া মনোরমা পুনরায় কহিল, "সে তো এখনই হবে না মা। আমার বোনঝি সুরমা রোগে মরণাপন্ন হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তার ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করবার কেউ নেই। এসেই যখন পড়েছি অন্ততঃ কিছুদিন এখন আমাকে সুরমার বাসাতেই গিয়ে থাকতে হবে।"

মায়ের মুখ হইতে যখন একবার কথা বাহির করিতে পারিয়াছে সামান্য কয়েকটা দিনের জন্য মনীষা আর পীড়াপীড়ি করিল না। স্বভাবতঃ গম্ভীরপ্রকৃতি ও স্বল্পভাষী রমা মাকে কাছে পাইয়া আজ উচ্ছল-আনন্দে চঞ্চলা হরিণীর ন্যায় ছুটাছুটি করিতে লাগিল। মৃত্যুঞ্জয়ের জন্য রেকাবে করিয়া জলখাবার লইয়া রমা বাহির হইয়া গেল।

মনীষা নত হইয়া ফলের খোসা ছাড়াইতে ব্যস্ত হইল।

ধনীর মেয়ে মনীষা নার্শেরীতে মানুষ হইয়াছে। সেও শৈশবে মাতৃহীনা। মাতৃস্নেহের জন্য তাহার অতৃপ্ত কাঙ্গাল মন মনোরমাকে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছে। রমাকে সে প্রাণের অধিক ভালবাসে। দারিদ্র্য ও দুঃখের কথা শুনিয়া তাহার কোমল অন্তঃকরণ রমার দুঃখ ও অভাব মোচনে সততই ব্যগ্র। কিন্তু রমার আত্মমর্য্যাদাবোধের কঠিন প্রস্তরে ব্যাহত হইয়া উহা বারংবার অভিমানে ক্ষুব্ধ হইয়া ফিরিয়া আসিত। তাই মায়ের উপর নিজের দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়া মনীষা বিজয়গর্ব্বে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। আজ হইতে সেও মমতাময়ী মনোরমার অফুরন্ত অপত্য-স্নেহের সমান অংশীদার।

॥ দশ ॥

শিল্পপতি স্যার মৃগাঙ্ক সান্যালের বয়ঃক্রম সত্তর বৎসর পূর্ত্তি উপলক্ষে দেশব্যাপী তাঁহার সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানে উৎসবের আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন হইয়াছে। প্রতিবৎসর শিল্পপতির জন্মোৎসবের আয়োজন লইয়া বিভিন্ন শিল্প-সংস্থার মধ্যে প্রতি-যোগিতা আরম্ভ হইয়া যায়। যে প্রতিষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে তাহার কর্ম্মকর্ত্তৃগণকে পুরস্কৃত করিবার একটি পরোক্ষ ব্যবস্থাও প্রচলিত আছে। স্যার মৃগাঙ্ক সান্যাল দেশের শিল্প-সমৃদ্ধির প্রতীক। তাই উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারিগণ ও বহু বিদেশী শিল্পনায়কও এই জয়ন্তী উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া ভারতবর্ষের শিল্প-প্রতিষ্ঠায় স্যার মৃগাঙ্ক সান্যালের অতুলনীয় অবদানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া থাকেন। শিল্পপতি প্রকাশ্যে এই জয়ন্তী উৎসবের আড়ম্বর ও সাফল্যকে তাঁহার পদমর্য্যাদাসুলভ একপ্রকার কুণ্ঠিত গাম্ভীর্য্যের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রচার-সচিবগণের মতে শিল্পপতির নিকট এই অনুষ্ঠানের উপযোগিতা ও তাৎপর্য্য নাকি ইহাই যে, এই উপলক্ষে দেশের শিল্পোন্নয়নে তাঁহার নব নব সাফল্য এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিকল্পে তাঁহার আন্তরিক আগ্রহ ও প্রযত্ন তিনি জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার সুযোগ লাভ করিয়া থাকেন।

সেদিন প্রাতঃকালে স্যার মৃগাঙ্ক সান্যাল অভ্যাসমত তাঁহার প্রাসাদোপম অট্টালিকার প্রশস্ত অলিন্দে পদচারণা

করিতেছিলেন। কক্ষাভ্যন্তর হইতে মনীষার কণ্ঠনিঃসৃত প্রভাতী সঙ্গীতের অপূর্ব্ব সুরধারা শারদপ্রভাতকে এক অনুপম মাধুর্য্যে প্লাবিত করিয়া দিতেছিল—

আলোকে মোর চক্ষু দুটি মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি,
হৃদ্‌গগনে পবন হল সৌরভেতে মন্থর,
সুন্দর হে সুন্দর!

* * *

মনীষা যখন দুইহাতে প্রাতরাশের সরঞ্জাম ও উপকরণ লইয়া বারান্দায় টেবিলের উপর রাখিল তখনও সদ্যঃসমাপ্ত সঙ্গীতের মূর্ছনা বৃদ্ধের ভক্তিরসাপ্লুত সমাহিতচিত্তে অনুরণিত হইতেছিল। তিনি যেন সমাধি হইতে জাগিয়া উঠিয়া গাঢ় আবিষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—"আজ কি গাইছিলে মা-মনি?"

মনীষা নত হইয়া পেয়ালায় কোকো ঢালিয়া দিতে দিতে লজ্জিতভাবে কহিল, "আগে খেয়ে নাও বাবা।"

সে শৈশব হইতে দেখিয়া আসিয়াছে একবার তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে এই অতিশয় কর্ম্মব্যস্ত ও মিতভাষী মানুষটিরও সময় সম্বন্ধে কোন ভ্রূক্ষেপই থাকে না। শিল্পপতি নিরস্ত না হইয়া কিংবা প্রাতঃভোজনে বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া তদ্‌গতভাবে কহিলেন, "বাক্য ও মনের অগোচরে যিনি তিনি অহরহই আমাদের নিকট আলোকের রূপে, আনন্দের রূপে, সৌন্দর্য্যের রূপে, অমৃতের রূপে নিজেকে প্রকাশিত কচ্ছেন। আমাদের সমস্ত দেহ-মন আলোকের স্পর্শে, পবনের স্পর্শে,

প্রেম ও কল্যাণের স্পর্শে এ্যায়োলিয়ান বীণাযন্ত্রের ন্যায় স্বঃতই স্পন্দিত-ঝঙ্কৃত হয়ে উঠছে। অবারিত প্রকাশের এই অপরিমেয় ঐশ্বর্য্যের মধ্যে নিজেদের আবিষ্কার করে আমরা ধন্য হয়েছি, নতুন জন্ম লাভ করেছি। কবিগুরুর অতুলনীয় সংগীতের এই মহৎ ভাবটিকে তুমি গ্রহণ করতে পেরেছ, মা-মনি?" বৃদ্ধের প্রসন্ন মুখমণ্ডল আত্মোপলব্ধির দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এই সময় পীতাম্বর চৌধুরী আসিয়া না পড়িলে শিল্পপতির তত্ত্বালোচনা যে কতক্ষণ চলিত বলা কঠিন।

"পিতা-পুত্রীর নিভৃত আলাপে বাধা দিলাম না কি?" বলিতে বলিতে পীতাম্বর চৌধুরী স্যার মৃগাঙ্ক সান্যালের পার্শ্বের চেয়ারখানিতে বসিয়া পড়িলেন। মনীষাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "তারপর একা একা ছুটির দিনগুলো কেমন কাটছে বলো। মৃগাঙ্কদা ক'টা দিন আর কোলকাতায় থাকেন—এই প্রকাণ্ড রাজপুরীতে একা থাকতে তোমার খুবই কষ্ট হয়, তাই না মা? আমি মৃদুলাকে কত বলি তোমার সঙ্গে এসে গল্প করতে, কিন্তু মেয়ের আমার সময় কই—নাচ-গান নিয়েই সমস্ত দিন মেতে আছে।"

একটু থামিয়া মনীষাকে আরও কাছে, আকর্ষণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "এই বয়সে মনের মত একটি সাথী চাই বই কি মা।"

চতুর ব্যারিষ্টার পীতাম্বর চৌধুরীর এই কথার তাৎপর্য্য কি হইতে পারে ভাবিয়া লজ্জাবনতমুখী মনীষা স্থান ত্যাগ করিবার একটা অজুহাত খুঁজিতেছিল। ভাবমগ্ন মৃগাঙ্ক

সান্যাল এতক্ষণে আবেশ কাটাইয়া প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। পীতাম্বর চৌধুরীর কথাগুলি তাঁহার কানে গিয়াছে কিনা ঠিক বুঝা গেল না। তিনি মনীষাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিলেন, "যাওতো মা-মনি, তোমার কাকামনির খাবারটা পাঠিয়ে দিতে বলে এসো।"

মনীষা চলিয়া গেলে পীতাম্বর চৌধুরী পূর্বকথার জের টানিয়া বলিলেন, "শিল্পের সমস্যা নিয়েতো তোমার দুর্ভাবনার অন্ত নেই, কিন্তু মনীষার সম্বন্ধেওতো তোমার একটা মনস্থির করে ফেলা উচিত। তোমার এই বিপুল শিল্পপ্রয়াসকে অব্যাহতভাবে চালিয়ে নিতে পারে, তোমার ঐতিহ্যকে যোগ্যতার সংগে বহন করতে পারে, অথচ একমাত্র মেয়েকে একেবারে তোমার কাছ-ছাড়া করতেও না হয়, এমন একটি ছেলে দেখে মনীষাকে এখন পাত্রস্থ করাই তো উচিত বলে আমার মনে হয়, তুমি কি বল মৃগাঙ্কদা ?"

মৃগাঙ্ক সান্যাল "হুঁ-না" কোন শব্দ না করিয়া কোকোর পেয়ালা তুলিয়া লইলেন। চতুর পীতাম্বর চৌধুরী এই প্রসঙ্গ লইয়া আর অধিক পীড়াপীড়ি করা অনুচিত হইবে মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিলেন।

শিল্পপতি বলিলেন, "ভারতীয় শিল্প আজ দুদিক থেকে আক্রান্ত হয়েছে। একদিকে শ্রমিক-বিরোধ ঘনীভূত হয়ে উঠছে, অন্যদিকে শ্রমিক কল্যাণের দোহাই দিয়ে ও শিল্প জাতীয়করণের নামে সরকারের অবাঞ্ছনীয় অনুপ্রবেশের ফলে স্বাধীনতা লাভের পরে এই দেশের শিল্পক্ষেত্রে অনেক জটিল

সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এই দ্বিমুখী আক্রমণের মধ্য দিয়ে আমাদের খুব সাবধানে পথ করে চলতে হবে পীতাম্বর।"

স্যার মৃগাঙ্ক সান্যাল কিঞ্চিত উত্তেজিতভাবে বলিয়া চলিলেন,—"শিল্পে শ্রমিকের উপর মালিকের নিরঙ্কুশ অধিকার ও কর্তৃত্বকে সরকার যে পরিমাণে curb করবে, উৎপাদনও সেই পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, শিল্প জাতীয়করণের সরকারী উদ্যম ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে সঙ্কুচিত করবে, ফলে শিল্পোন্নতি ব্যাহত হবে—একথা "শিল্প জাতীয়করণ কমিশনের" নিকট আমার সাক্ষ্যে আমি দৃঢ়তার সংগে বলেছি। তা ছাড়া ইণ্ডাষ্ট্রির তরফ থেকে সরকারের নিকট একটি শক্তিশালী ডেপুটেশন পাঠাবার ব্যবস্থাও ঠিক করে ফেলেছি।"

"ফর দি বেনিফিট অব দি কান্ট্রি, ইণ্ডাষ্ট্রি উইল রেজিষ্ট অল্ সর্ট্স্ অফ্ অফিশিয়াল ইণ্টারভেন্শন্"। পীতাম্বর চৌধুরী উত্তেজিতভাবে বলিয়া চলিলেন, "বাট্ ইনসাবরডিনেশন অব দি লেবার ইস দি মোষ্ট পোটেন্সিয়াল সোর্স অব ডেঞ্জার টু দি ইণ্ডিয়ান ট্রেড এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি। স্যার মৃগাঙ্ক সান্যালের ব্যক্তিত্ব আর ঝুনো ব্যারিষ্টার পীতাম্বর চৌধুরীর শানিত-বুদ্ধি শিল্পে বেসরকারী প্রভুত্বকে নষ্ট করবার যে কোন ষড়যন্ত্রকে সক্সেসফুলি প্রতিরোধ করবে।" পীতাম্বর চৌধুরী অন্তরঙ্গতার সহিত আবাল্যসখা মৃগাঙ্ক সান্যালের স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া বিকট শব্দে হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু ইহাতেও মৃগাঙ্ক সান্যালের কোনই ভাবান্তর পরিলক্ষিত হইল না।

ঘূর্ণ্যমান চেয়ারখানাকে পীতাম্বর চৌধুরীর দিকে কিঞ্চিৎ ঘুরাইয়া লইয়া শিল্পপতি শুষ্ক মৃদু হাসিয়া কহিলেন—"First of all we may have to fight it out in the home front. Our Arun holds a different view."

ঝানু ব্যারিষ্টার পীতাম্বর চৌধুরীর মুখের উপর দিয়া প্যাঁজা তুলোর মত একখণ্ড হালকা মেঘ ভাসিয়া গেল। তিনি উৎকণ্ঠিতভাবে টেবিলের উপর সাগ্রহে ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

"আমাদের অরুণ কি বলে জানো পীতাম্বর? সে বলে আজকের দিনে শ্রমিক স্বার্থের সংগে মালিকশ্রেণী যতখানি মানিয়ে চলতে পারবে, তার উপরে নির্ভর করছে শিল্পের ভবিষ্যৎ। অরুণ সেদিন আমার মুখের উপরেই বলে গেল, সে সারা পৃথিবী ঘুরে দেখে এসেছে কমবেশী সর্বত্রই আজ শিল্প রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দিকেই ঝোঁক—আমাদের দেশেও ইতিহাসের এই অনিবার্য্য পরিণামকে কেউ নাকি ঠেকাতে পারবে না। অরুণ স্পষ্টই বললে শ্রমিকের ন্যায্য দাবিকে অস্বীকার করে করে, সরকারের ন্যায্য প্রাপ্য ফাঁকি দিয়ে দিয়ে আমাদের দেশের মালিকশ্রেণীই ন্যাশনালাইজেশনকে এগিয়ে আনছে।" প্রবল উত্তেজনায় শিল্পপতি উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও দুইহাত পশ্চাতে আড়াআড়িভাবে স্থাপন করিয়া চঞ্চলভাবে পায়চারি করিতে লাগিলেন। পুত্রের অশোভন স্পর্দ্ধায় পীতাম্বর চৌধুরী স্তম্ভিত হইলেন, মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

স্যার মৃগাঙ্ক সান্যাল নিস্তেজভাবে বসিয়া কহিলেন, "জানো পীতাম্বর, অরুণের এই অনুচিত স্পর্দ্ধাকেও আমি ক্ষমা করেছি।

জীবনে কোনদিন কারও ঔদ্ধত্যকেই যে সহ্য করেনি, সে কিনা আজ এত সহজেই একজন অপরিণতবুদ্ধি বালকের অমার্জ্জনীয় স্পর্দ্ধাকে ক্ষমা করতে পারলো, আমার নিজের ব্যবহারে আমি নিজেই বিস্মিত হয়ে গেছি। কিন্তু কেন? সে আমার আবাল্য সুহৃৎ পীতাম্বরের ছেলে বলে নয়, কিংবা পাশ্চাত্যদেশে পাঠিয়ে আমিই তাকে শিল্পপরিচালনায় উচ্চশিক্ষা ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জ্জন করিয়ে এনেছি বলেও নয় নিজের সন্তানের যে ব্যবহার আমি সহ্য করতাম না, অরুণের সে ব্যবহার আমি মুখ বুজে সহ্য করে গেছি। কেন?"

মৃগাঙ্ক সান্যাল কণ্ঠস্বর নামাইয়া বলিতে লাগিলেন,—"তোমাকে কোনদিন বলিনি পীতাম্বর কিন্তু, আমার প্রাণাধিক প্রিয় একমাত্র মেয়ে মনীষাকে আমি অরুণের হাতে সমর্পণ করব, এ ছিল আমার বহুকালের আশা। অরুণের মত মেধাবী ও কর্ম্মঠ ছেলের কাছ থেকে আমি অনেক কিছু আশা করেছিলাম পীতাম্বর। কিন্তু আজ আমার মনে সংশয় জেগেছে। অরুণ ও মনীষার মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, ওদের ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে তা কল্যাণকর হবে মনে করেই আমি একেবারে প্রশ্রয় না দিলেও ওদের নির্দ্দোষ মেলামেশায় কোনদিন বাধা দিই নি। তাই আজ আমাদের উভয়ের এই মত-বিরোধের কথা শুনতে পেলে মনীষা যে কতখানি আঘাত পাবে সে চিন্তাই আমাকে বিচলিত করেছে সবচেয়ে বেশী।"

মৃগাঙ্ক সান্যাল অবসন্নভাবে নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে বসিয়া

পড়িলেন। মনীষা নিজেই দুই হাতে কাকামণির জন্য খাবারের থালাটা বহন করিয়া আনিতেছিল। পিতার মুখে অরুণের নামোল্লেখ শুনিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া সে সমস্তই শুনিয়াছে। তাহার মাথা ঝিম ঝিম করিয়া উঠিল—অবশ হস্ত হইতে খাবারের থালাটি পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। কিছুক্ষণ নিজের সঙ্গে লড়াই করিয়া নিজেকে অনেকখানি সংযত করিয়া লইয়া মনীষা ধীরপদে প্রবেশ করিল। খাবারের থালাটি পীতাম্বরের সম্মুখে স্থাপন করিয়া মনীষা চেয়ারের হাতল ধরিয়া পিতার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল ও রূপালী চুলের মধ্যে অন্যমনস্ক-ভাবে অঙ্গুলি চালনা করিতে লাগিল।

—"তোমার শরীরটা আজ ভাল নেই বাবা ?"

—"আমি তো বেশ সুস্থই আছি মা-মনি"

—"তবে যে তোমাকে এমন ক্লান্ত দেখাচ্ছে। কি হয়েছে আমায় খুলে বলো বাবা, আমিতো কোনদিন তোমার অবাধ্য হইনি।"

শিল্পপতি আবেগভরে মেয়েকে কাছে টানিয়া লইলেন ও তাহার পৃষ্ঠদেশে সস্নেহে হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। পাছে দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইয়া পড়ে এই ভাবিয়া তিনি কোন উত্তর করিলেন না।

বহুমূল্য রৌপ্যখচিত উর্দ্দিপরিহিত বিশালবপু দ্বারবান সমশের আসিয়া নবাবী কায়দায় কুর্নিশ করিয়া দাঁড়াইল। গালপাট্টাদাড়ি ও আকর্ণ-বিস্তৃত একজোড়া ঘন পুরু গোঁফের ফাঁক দিয়া সে অনভ্যস্ত উচ্চারণে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা শব্দে জানাইল

ওয়েলফেয়ার সাহেব তাঁহার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছে। দর্শনার্থীকে উপরে লইয়া আসিবার ইঙ্গিত করিলে কিছুক্ষণের মধ্যে দ্বারবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ওয়েলফেয়ার অফিসার মিঃ উপানন্দ হাজরা ভারী বুটের শব্দে সচকিত করিয়া দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। আড়ালে দাঁড়াইয়া টাই ও কলারটা মসৃণ করিয়া ও কোটের ভাঁজগুলি টানিয়া সোজা করিয়া লইয়া উপরে আসিয়া পাশ্চাত্য রীতি-অনুযায়ী বিশুদ্ধ ইংরাজি প্রথায় অভিবাদন করিয়া তিনি আসন গ্রহণ করিলেন।

মিঃ উপানন্দ হাজরা স্বাধীনতাপূর্বযুগে কোনো ইংরেজ গভর্ণরের এ-ডে-কং ছিলেন। ইংরেজ গভর্ণর বিদায় লইয়াছে, কিন্তু মিঃ উপানন্দ হাজরার চাল-চলন ও আদব-কায়দায় সাহেবিয়ানা এমনই রপ্ত হইয়া গিয়াছে যে তিনি শত চেষ্টা করিয়াও আর ভারতীয় হইতে পারেন না। দীর্ঘ ঋজু-দেহ, চোয়াল বাহিরকরা লম্বা তামাটে মুখ, ললাটের কুঞ্চিত বলি-রেখায়, সর্বোপরি চেহারার বিজাতীয় রুক্ষতায় তাহার এই স্বাতন্ত্র্য অতিশয় স্পষ্ট। নিজেকে তিনি জন বুলের একজন বিশ্বস্ত প্রতিনিধি বলিয়াই মনে করেন। শুনা যায় বিদায়ী ইংরেজ গভর্ণমেণ্টেরই অনুরোধে তিনি স্যার মৃগাঙ্ক সান্যালের অধীনে বর্ত্তমান পদে বহাল হইয়াছেন। ওয়েলফেয়ার অফিসার হইলেও নোংরা নেটিভ শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের মত কোমলতা তাহার চরিত্রে আদৌ নাই। মালিকের স্বার্থ ও ভুয়া ডিসিপ্লেনের লৌহ-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া তিনি শ্রমিক-কর্ম্ম-চারীদের প্রাণ অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছেন।

ইংরেজি আচার-ব্যবহারে মিঃ হাজরা যতখানি রক্ষণশীল, ব্যক্তিগত নৈতিক-চরিত্র সম্বন্ধে ঠিক ততখানি উদার। তাহার বিবাহিত স্ত্রী মিসেস মাতঙ্গিনী হাজরার সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছে। মাতঙ্গিনীর পিতা নলীনাক্ষ ইংরেজ সরকারের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মিঃ হাজরা সরকারী উচ্চপদ প্রাপ্তির লোভে মাতঙ্গিনীকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু নলীনাক্ষের মৃত্যুর পর হইতে তিনি স্ত্রীর সহিত আর সম্পর্ক রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই।

জনশ্রুতি, মিঃ হাজরা ফিরিঙ্গি-পাড়ায় আজকাল এক প্রখ্যাত বিদেশী হোটেলের উৎকৃষ্ট বিলাস-ব্যসনের মধ্যে নীতি-বিগর্হিত জীবন যাপন করেন। যে উদ্ধত-স্বভাব উপানন্দ হাজরার প্রতাপে কারখানার শ্রমিক-কর্ম্মচারীরা সর্বদা সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত, মনিবের সম্মুখে আসিয়া তিনি বিনয়ে একেবারে মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিলেন। অতিশয় সঙ্কোচের সহিত মিঃ হাজরা ইঙ্গ-বঙ্গ ভাষায় তাহার মন্তব্য পেশ করিলেন। "স্যার টু এনক্রোচ অন ইওর ভ্যালুয়েবল টাইম, আমি এসেছিলুম স্যার, Aniversery functionটাতে কাকে preside করতে request করবো। আপনি যার নাম suggest করবেন.........”

কাঁধটাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়া দুইহাত নাড়াইয়া মিঃ হাজরা অনেকটা নাটকীয় ভঙ্গীতে বলিলেন, "Surely it will be an honour to anyone in this country to preside over Sir Sanyal's birthday festival."

এই ধরণের উক্তিতে মনিবের মনস্তুষ্টি হইবে মনে করিয়া মিঃ হাজরা উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু স্যার মৃগাঙ্ক সান্যালের গম্ভীর মুখের পানে তাকাইয়া তাহার উৎসাহ নিভিয়া গেল। তিনি অধিকতর সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, "আর বিলম্ব হলে আমরা যে difficultyতে পড়ে যাব স্যার। Programmeটা প্রস্তুত করে আজই Press এ পাঠিয়ে দিলে ভাল হয়।"

"Finance Minister ও Labour Minister দু'জনেই তাঁদের সম্মতি জানিয়ে আমায় তার করেছে। President ও Chief Guest হিসেবে এঁদের দু'জনেরই নাম আপনি announce করতে পারেন মিঃ হাজরা।"

গম্ভীরভাবে কথা কয়টি বলিয়া শিল্পপতি টেবিলের উপর হইতে একখানা ট্রেড-জার্ণাল টানিয়া লইয়া তাহাতে মনোনিবেশ করিলেন।

স্যার মৃগাঙ্ক সান্যালের বক্তব্য ধরিয়া পিতাম্বর চৌধুরী বলিলেন, "মিঃ হাজরা, আমাদের নিকট এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব যে কতখানি তা আপনি নিশ্চয়ই জানেন। আয়োজনের কোথাও যেন এতটুকু ত্রুটি না থাকে। নিমন্ত্রিত অতিথিদের আদর-অভ্যর্থনা, decoration ও illuminationএর জন্য কোম্পানির ব্যয় লাঘব করবার কোন চেষ্টা করবেন না। সমস্ত আয়োজন এই প্রতিষ্ঠান ও তার মালিকের গৌরব ও মর্য্যাদার সম্পূর্ণ উপযুক্ত হওয়া চাই।"

একটু থামিয়া পীতাম্বর চৌধুরী পুনর্বার কহিলেন, "অনুষ্ঠানের কর্মসূচীর মধ্যে শ্রমিকদের আমোদ-প্রমোদের প্রচুর ব্যবস্থা

থাকা চাই—ফিল্‌ম-শো, যাত্রা, নাচ-গান, খেলা-ধূলা, এক কথায় শ্রমিক-কর্মচারিদের মন ও সহযোগিতা আকর্ষণ করবার সবরকম ব্যবস্থাই থাকবে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও প্রমোদ-অনুষ্ঠানে শ্রমিক-কর্ম্মচারিগণ যাতে বিপুলসংখ্যায় যোগদান করে সে বিষয়ে আপনি ব্যক্তিগতভাবে দৃষ্টি রাখবেন।"

স্যার মৃগাঙ্ক সান্যালের পার্শ্বে পীতাম্বর চৌধুরীকে উপবিষ্ট দেখিয়া মিঃ উপানন্দ হাজরা হতাশ হইয়াছিলেন। কেননা জন্মোৎসবের প্রীতিকর প্রসঙ্গে কথাচ্ছলে অরুণ চৌধুরীর বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগগুলি স্যার মৃগাঙ্ক সান্যালের সম্মুখে উত্থাপন করিবেন প্রধানতঃ এই অভিসন্ধি লইয়াই মিঃ হাজরা সাত-সকালে মালিকের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। পীতাম্বর চৌধুরীর উপস্থিতির দরুণ তাহার এই অভিসন্ধি পূর্ণ হইবার নয়। এইহেতু পীতাম্বর চৌধুরীর অযাচিত উপদেশ ও নির্দ্দেশকে মিঃ হাজরা যদিও খুব প্রসন্নমনে গ্রহণ করিতে পারিলেন না, তথাপি স্যার মৃগাঙ্ক সান্যালের উপর পীতাম্বর চৌধুরীর প্রভাব যে কতখানি ইহা তাহার অপরিজ্ঞাত ছিল না বলিয়াই মিঃ হাজরা পীতাম্বর চৌধুরীর প্রস্তাবের প্রতি ঘাড় নাড়িয়া আনুগত্য জানাইলেন।

স্যার মৃগাঙ্ক সান্যাল ট্রেড-জার্ণালের উপর হইতে দৃষ্টি তুলিয়া লইয়া মিঃ উপানন্দ হাজরার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া কহিলেন,—"আমার Personal Accountএ যে ৩ লাখ টাকা পড়ে আছে, সে টাকাটা আমি শ্রমিকদের জন্য একটা যক্ষ্মা হাঁসপাতাল নির্মাণের উদ্দেশ্যে দান করতে চাই।

শ্রম-মন্ত্রীর হাতে দিতে হবে। আর বি টি রোডের উপর আমাদের যে ৫০ একর জমি খালি পড়ে আছে, অরুণকে বলবেন তার একটা দানপত্র লিখিয়ে রাখতে।"

অরুণের নামোল্লেখে মিঃ উপানন্দ হাজরা সর্বাঙ্গে যেন বৃশ্চিক দংশন অনুভব করিলেন। অরুণের কর্ত্তৃত্ব তিনি সহ্য করিতে পারেন না। শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে তাহার ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তা মিঃ হাজরার পক্ষে প্রথম্ হইতেই নিদারুণ অস্বস্তির কারণ হইয়াছে! তথাপি মালিকের অসন্তোষভাজন হইবার ভয়ে মনোভাব যথাসম্ভব গোপন করিয়া উৎসাহের সহিত সম্মতিজ্ঞাপন করিলেন।

যথোচিত ধন্যবাদ ও অভিবাদনান্তে মিঃ হাজরা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলে পীতাম্বর চৌধুরী কহিলেন, "মিঃ হাজরা, মনে রাখবেন এই অনুষ্ঠানের সাফল্যের উপর আপনার ও এই প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করছে।"

ব্যারিষ্টার পীতাম্বর চৌধুরী ইচ্ছা করিয়াই 'আপনার' শব্দটির উপর কিছু অতিরিক্ত জোর দিলেন। শিল্পপতি স্যার মৃগাঙ্ক সান্যাল মিঃ উপানন্দ হাজরার দিকে চাহিয়া স্মিতহাস্যে তাহাকে আপ্যায়িত করিলেন।

॥ এগার ॥

স্যার মৃগাঙ্ক সান্যালের দেশব্যাপী সমস্ত শিল্পসংস্থায় শিল্পপতির জন্মোৎসব নির্দ্দিষ্ট দিনে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। মিঃ উপানন্দ হাজরার নিপুণ ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানের প্রতিটি অঙ্গই বেশ নিখুঁত, জমকালো ও আকর্ষণীয় হইয়াছিল। সরকার-সমর্থক ও শিল্পপতির পৃষ্ঠপোষিত সংবাদপত্রগুলিতে উৎসবের বহু চিত্রশোভিত বিবরণের সহিত শিল্পপতির কর্ম্মময়-জীবন ও শিল্প-কৃতিত্বের পরিচয়জ্ঞাপক প্রবন্ধবলীও প্রকাশিত হইয়াছিল। এমন কি, বামপন্থী সংবাদপত্রগুলিও বিজ্ঞাপনের মায়া ছাড়িতে না পারিয়া উৎসবের বিস্তৃত বিবরণই অপেক্ষাকৃত ছোটহরফে মুদ্রিত করিয়াছে।

খ্যাতনামা শিল্পীদের দ্বারা প্রস্তুত প্রশস্ত মণ্ডপের প্রবেশ-দ্বারে সতরটি ঘৃতের প্রদীপ স্নিগ্ধ আলোক বিকীর্ণ করিয়া বিধাতার মঙ্গল আশীর্ব্বাদ আবাহন করিয়া আনিতেছিল। শ্রমিকদের মধ্যে কর্ত্তব্যবোধ জাগাইবার জন্য ও শ্রমিকগণকে ত্যাগ স্বীকারে প্রবৃত্ত ও উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে মণ্ডপের প্রধান প্রবেশ-পথের দুইদিকে কয়েকমাস পূর্ব্বে শিল্পপতির কয়লাখনি ও ইস্পাত কারখানায় যে দুইজন শ্রমিক অসমসাহসে মালিকের স্বার্থ-সংরক্ষণ করিতে গিয়া নিজেদের প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে তাহাদের দুইটি আবক্ষমূর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল।

এই উপলক্ষে শিল্পপতির দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া ও শুভেচ্ছা জানাইয়া দেশ-দেশান্তর হইতে যে বিপুলসংখ্যক বাণী

প্রেরিত হইয়াছিল, সভার প্রথমে তাহা প্রায় দেড় ঘণ্টা পঠিত হইবার পর সময়ের স্বল্পতার জন্যই পরিত্যক্ত হয়। সমাপ্তিমুখে পীতাম্বর চৌধুরী একান্তে শ্রম-মন্ত্রীকে অস্ফুটস্বরে কি বলিয়া ৩ লাখ টাকার চেক ও জমির দানপত্রখানি হাতে লইয়া সানন্দে ঘোষণা করিলেন, শ্রম-মন্ত্রীর অনুরোধে শিল্পপতি দানবীর স্যার মৃগাঙ্ক সান্যাল শ্রমিকদের জন্য একটি যক্ষ্মা হাসপাতাল নির্ম্মাণ-কল্পে এই ৩ লাখ টাকা ও পঞ্চাশ একর লাখেরাজ-জমি সরকারের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সংগে সংগে সমাগত জনতার মধ্য হইতে বিপুল হর্ষধ্বনি উত্থিত হইয়া মহান দাতাকে অভিনন্দিত করিল।

মিঃ উপানন্দ হাজরা তাহারই উদ্যোগে স্যার মৃগাঙ্ক সান্যালের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে সংগৃহীত ৭০ হাজার টাকার একটি তোড়া কর্ম্মচারীদের কৃতজ্ঞতা ও অকপট শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ শিল্পপতির হস্তে অর্পণ করিলেন। শিল্পপতি নিজেই উঠিয়া বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সেই টাকাটাও শ্রমিক-কল্যাণে ব্যয় করিবার সাধুসঙ্কল্প ঘোষণা করিলেন।

সভান্তে কারখানার নিকটবর্ত্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তরে শ্রমিক-মালিক ও সম্ভ্রান্ত অতিথিগণের একত্র পংক্তি-ভোজনের আয়োজন হইয়াছিল।

স্যার মৃগাঙ্ক সান্যাল একটি অতিকায় পাত্র হইতে স্বহস্তে একহাতা মিষ্টান্ন একজন শ্রমিকের পাত্রে ঢালিয়া দিলেন। সংগে সংগে চারিদিক হইতে অসংখ্য ক্যামেরার তীক্ষ্ণদৃষ্টি শিল্পপতির ঔদার্য্য ও দাক্ষিণ্যের এই অভ্রান্ত-নিদর্শন

াবে অঙ্কিত করিয়া রাখিল। সমস্ত মিলিয়া অনুষ্ঠানটি সরকার ও জনসাধারণের মনে গভীর রেখাপাত করিতে সমর্থ হইল।

সন্ধ্যা ঘোর হইয়া আসিয়াছে। কৃষ্ণ পক্ষের অন্ধকার রাত্রি গৌরাঙ্গী বসুন্ধরাকে গাঢ় আলিঙ্গনে বাঁধিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। দুই পার্শ্বের শ্রেণীবদ্ধ স্বপ্নালোকিত কুঠরীগুলির মধ্যবর্ত্তী অন্ধকারময় সংকীর্ণ পথটি ইহারই মধ্যে প্রায় জনহীন হইয়াছে। দপ্তরের কাজ শেষ করিয়া অরুণ শ্রমিক-ব্যারাকের রাস্তাটা প্রতিদিনের মত আজিও হাঁটিয়া পার হইতেছিল। বি, টি, রোডের উপর কারখানার প্রধান তোরণদ্বারে গাড়ি রাখিতে নির্দ্দেশ দিয়া অরুণ প্রত্যহ শ্রমিক-আবাসের সংলগ্ন গলিটা পদব্রজে অতিক্রম করিয়া যাইত।

পথের দুইদিকে দূর ব্যবধানে যে দুই চারিটা জলের কল বসিয়াছে তাহার প্রত্যেকটির সম্মুখেই অসংখ্য নারী-পুরুষ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া পানীয়-জলের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। মারামারি, হুড়াহুড়ি ও গালিগালাজ অবিশ্রাম চলিতেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলে সকলেরই ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়া স্বাভাবিক। রান্নাবান্না, ঘর-গৃহস্থালী কাহার না আছে, আবার কাহারও কাহারও নাইট-সিফ্‌টের ডাকে হাজির হইবার তাড়াও আছে। কলের পার্শ্বের অগভীর নরদামাটা পাঁক ও জঞ্জালে অবরুদ্ধ হইয়া গেছে। নোংরা জল উপচাইয়া রাস্তার ঢালু অংশটা প্লাবিত করিয়াছে। তাহারই মধ্যে এতগুলি লোক জলের প্রত্যাশায় অস্থিরভাবে

দাঁড়াইয়া। সম্মুখস্থ উচ্ছিষ্ট ময়লা ও আবর্জ্জনার দীর্ঘকাল সঞ্চিত স্তূপ হইতে অবিরাম এমন উৎকট দুর্গন্ধ ছুটিতেছে যে, পেটের নাড়িভুঁড়ি পর্য্যন্ত পাক খাইয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহে। অদূরে রাস্তার উপরেই একটা মৃত গো-বৎস লইয়া দুইটা নেড়ী-কুকুরে কাড়াকাড়ি লাগিয়া গেছে।

অরুণ কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ এই নরককুণ্ডের পানে তাকাইয়া রহিল। রাস্তায় আলোকের নিতান্ত অভাব না হইলে দেখা যাইত তাহার কোমল শান্ত মুখচ্ছবি কিভাবে ইস্পাতের মত কঠিন হইয়া উঠিতেছে, আজানুলম্বিত প্রসারিত হস্তাঙ্গুলি কিভাবে মুষ্টিবদ্ধ হইয়া সঙ্কল্পে সুদৃঢ় হইতেছে। ক্ষিপ্রপদে আগাইয়া গিয়া অরুণ ডাকিল, "ইয়াসিন।"

অরুণের কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভিড়ের মধ্যে একটা চাপা আলোড়ন উপস্থিত হইল। অস্পষ্ট ছায়া মূর্ত্তিগুলির মধ্য হইতে একজন দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠদেহ ও কৃষ্ণকায় মধ্যবয়সী লোক ডান হাতের বালতিটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে একখানি ইটের উপর স্থাপন করিয়া তাহার উপর বাম হাতের মাটির কলসীটা রাখিয়া দিয়া সসম্ভ্রমে আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

"তোরা এতগুলো লোক একটা কলের সামনে ভিড় করে আছিস কেন? উৎসবের মধ্যে যে নূতন জলের কলগুলো বসানো হয়েছিল, সেগুলি কি হলো? তোদের স্বভাবই এই— একজায়গায় দাঁড়িয়ে ঠেলাঠেলি করবি, তবু দুপা হেটে গিয়ে জল আনবিনে। এ তোদের ভারী অন্যায় ইয়াসিন।"

"সেগুলো তো হুজুর কবেই খারাপ হয়ে গেছে।

ওয়েলফেয়ার-সাবকে বলতে তিনি সাফ জবাব দিয়ে দিলেন—এগুলো আর মেরামত হবে না, উৎসবের জন্যে 'টেম্পারি' বসান হয়েছিল। আমাদের আগে যে-ভাবে চলছিল এখনও সেভাবেই চলবে।"

ঢোক গিলিয়া ইয়াসিন সর্দার বলিয়া চলিল,—"কোম্পানির টাকা যেভাবে খরচ হয় তাতে কার কি! নইলে হুজুর, তিরিশ-চল্লিশ হাজার টাকা একেবারে জলে গেল। আমরা কুলি-মজুর—বড়লোকের কথা নিয়ে আলোচনা করতে নেই। তা নয়তো কিছু আর আমাদের জানতে বাকী নেই। শুনলুম, হুজুর বলেছিলেন ঐ টাকায় পাওয়ার হাউসের সামনের খালি মাঠটাতে একটা দীঘি কাটাতে। তাতে কারখানার জন্যে বিজলীর খরচও কম পড়তো, আর এই হাজার হাজার গরিব-দুঃখীর জলকষ্ট দূর হতো। কিন্তু ওয়েলফেয়ার সাহেবের মর্জি, নানা ছুতো-নাতা করে শেষ পর্য্যন্ত তারই কোন এক আত্মীয় কণ্টাক্টরকে দিয়ে এতগুলো টাকা একেবারে গাব করে নিলে…কি কথায়, কোন কথা এসে পড়েছে। দেখবেন হুজুর, এ যেন আবার ওয়েলফেয়ার সাহেবের কানে না যায়, তাহলে আর রক্ষে থাকবে না।"

"না তোর কোন ভয় নেই, ইয়াসিন। তোদের সব কথা তুই আমার কাছে নির্ভয়ে প্রকাশ করতে পারিস।" অরুণ তাহাকে আশ্বস্ত করিল।

"এত যে ঘটা করে উৎসব হলো, কত কি আমোদ-ফুর্ত্তি, হই-হল্লা করা হলো; কিন্তু তার ফল যে আমাদের আজও ভোগ

করতে হচ্ছে, কে আর তার খবর রাখছে বলুন! ইট-পাথরে নরদমার মুখটা বন্ধ হয়ে গেছে—যতসব এঁটো-জঞ্জাল বস্তির মধ্যে জড়ো করে রাখা হয়েছে—পরিষ্কার করবার নামটিও নেই। দুর্গন্ধে পেটের ভাত উল্টে আসে। তিন-চার দিন বলে বলে এর কোন বিহিত করতে পারলুম না। আমরা কি মানুষ নই হুজুর, না আমাদের প্রাণের কোন দামই নেই? ভয়ে কেউ কথাটি বলে না, হুজুর জানবেন কি করে। এই যে আমাদের এক হপ্তার রুজি জোর জবরদস্তি করে কেটে নিয়ে মালিককে তার জন্মদিনে ঘটা করে সেলামী দেয়া হলো, তাতে যে গরীব-মজুরদের কষ্টের শেষ নেই। গরীবের ভাত মেরে নিজের আখের ভাল করা, অন্যের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে নিজের উদর পূর্ত্তি করা একি আমরা বুঝি না হুজুর?" কথা শেষ করিয়া ইয়াসিন সর্দ্দার পশ্চাতে তাকাইয়া দেখিল তাহার নিশানা যথাস্থানে রহিয়াছে কিনা।

উপানন্দ হাজরার অত্যাচার-অবিচারের কাহিনী যে অরুণের কানে একেবারেই আসে নাই তাহা নহে। এমন কি উপানন্দ হাজরার ব্যবহারে তাহার অধিকার ও কর্ত্তৃত্বের প্রতি সর্বদাই যে একটা চাপা অসন্তোষ প্রকাশ পাইত, তাহাও অরুণের লক্ষ্য এড়ায় নাই। তথাপি শ্রমিকগণের কল্যাণ-সাধনের জন্যই যাহাকে নিশ্চিতভাবে নিযুক্ত করা হইয়াছে, শ্রমিকের যথার্থ কল্যাণ ও সুখ-সুবিধার প্রতি তাহার এই স্বেচ্ছাকৃত উপেক্ষা ও উদাসীনতা যে এমন নির্দ্দয় ও নির্লজ্জভাবে প্রকাশ পাইতে পারে তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। মালিকের

শোষণ-শাসন তবু একটা নিয়মের অধীন, কিন্তু সুযোগসন্ধানী স্বার্থান্বেষী উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের লোভ ও অন্যায় জুলুম যেমন নিরঙ্কুশ তেমনি সীমাহীন।

প্রবল উত্তেজনায় তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া ইয়াসিন সর্দারের কাঁধে অন্তরঙ্গভাবে হাত রাখিয়া অরুণ সমবেদনাপূর্ণকণ্ঠে কহিল,—"আর কতকাল তোরা এসব মুখ বুজে সইবি ইয়াসিন! তোদের অসুবিধার কথা, প্রয়োজন হলে উপরওয়ালাদের দুর্নীতির কথা, খোদ মালিককে জানাতে পারিস না? এসব কথা তাঁর কানে গেলে তিনি নিশ্চয়ই এর একটা প্রতিবিধান করবেন। কোম্পানীর আয় বাড়াবার জন্যে, দেশের সম্পদ বাড়াবার জন্যে তোরা যেমন আন্তরিকভাবে খাটছিস, কোম্পানিও তোদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করবে বইকি। কর্ত্তব্য তো কখনও একতরফা হতে পারে না—কোম্পানির প্রতি তোদের যতখানি কর্ত্তব্য, তোদের সম্বন্ধে কোম্পানির কর্ত্তব্য তার চেয়ে কম নয়।"

একটু থামিয়া বেদনাজড়িত কণ্ঠস্বরকে পরিষ্কার করিয়া লইয়া শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে অরুণ কহিল,—"হ্যাঁ, কোম্পানি যদি তার কর্ত্তব্য ক্রমাগতই ভুলতে থাকে, তোদের ন্যায্য দাবি যদি বারেবারেই উপেক্ষিত হতে থাকে, তবে কোম্পানিকে তার কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়ে দেবারও ন্যায্য দাবি আদায় করে নেবার মত সামর্থ্যও তোদের রাখতে হবে ইয়াসিন।"

ইয়াসিন নত হইয়া অরুণের পদ-ধূলি লইল। অরুণের

সহানুভূতিপূর্ণ ও উৎসাহব্যঞ্জক কথায় তাহার অন্তর কৃতজ্ঞতায় কানায়-কানায় ভরিয়া উঠিল। অরুণ যেদিন হইতে ওয়ার্কস্-ম্যানেজারের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে, তাহার সরল সস্নেহ-ব্যবহার সেইদিনই কারখানার হাজার হাজার শ্রমিকের চিত্তজয় করিয়া লইয়াছে। তাহারা জানে শ্রমিকের সহিত ওয়ার্কস্-ম্যানেজার অরুণ চৌধুরীর সম্পর্ক কারখানার চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, পরন্তু কারখানার বাহিরে শ্রমিকের দুঃখ—দৈন্যপ্রপীড়িত প্রাত্যহিক জীবন পর্য্যন্ত তাহা ব্যাপৃত। স্নেহশীল কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতা যেমন কঠোর নিয়মে পুত্রের পাঠ আদায় করিয়া লন, আবার পাঠের সময় উত্তীর্ণ হইলেই তাহার সকল আব্দার হাসিমুখে সহ্য করেন, অফুরন্ত স্নেহে পুত্রকে অভিসিঞ্চিত করিয়া দেন, অরুণও তেমনি শ্রমিকদের কর্ত্তব্য-কর্মে যেমন কঠোর ও শৃঙ্খলপরায়ণ, ব্যক্তি-সম্পর্কে তেমনি অমায়িক স্নেহশীল। তাই কারখানার সাধারণ শ্রমিকের সহিত কর্মরত অরুণ চৌধুরীকে তারা যেমন শ্রদ্ধা করে, ব্যারাকে শ্রমিক-শিশুর রুগ্ন-শয্যা-পার্শ্বে উপবিষ্ট অরুণকে তারা তেমনি ভালবাসে।

—"আমাদের মেরুদণ্ড কি আর রেখেছে হুজুর? মজুরদের যে ক'টা মাথা ছিল, সব ক'টাই যে কোম্পানি কিনে নিয়েছে। যাদের কথায় মজুররা উঠত বসতো, জান কবুল করতো, তারাই আজ কোম্পানির ডানহাত। সেবার মন্বন্তরের বছর লঙ্গরখানা খোলার দাবি নিয়ে আমরা ধর্মঘটের নোটিশ দিয়েছিলাম। শেষসময়ে কোম্পানির ঘুষ খেয়ে

সম্বন্ধীরা বেইমানি করলে!" ইয়াসিন সর্দার আক্রোশে ফুলিতে লাগিল।

সরকারের সমর্থনপুষ্ট প্রভূত ক্ষমতাশালী মালিক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে দরিদ্র ও নিঃসহায় শ্রমজীবিদের একমাত্র হাতিয়ার তাদের একতা, সংঘশক্তি। তাই সর্বদেশে সংগ্রামের সর্বস্তরে মালিকশ্রেণী শ্রমিকদের সেই সংঘশক্তিকে বিনষ্ট করবার জন্য, শ্রমিকের ঐক্যে ফাটল ধরাবার জন্য নানা হীন চক্রান্তে লিপ্ত হয়।

ইয়াসিন বলিয়া চলিল, "এই দেখুন না, আমরা রোদ-জল মাথায় করে এক ফোঁটা জলের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তার কলে দাঁড়িয়ে থাকি, আর বেইমানদের প্রত্যেকের বাড়ীতে আলাদা জলের কল। আমাদের কি আমাদের ছেলেপুলেদের বেমারী হলে কোম্পানীর দাওয়াইখানা থেকে বরাদ্দ কেবল পিটুলি-গোলা লাল জল, আর নাতজামাইদের বাড়ীতে গিয়ে দেখুন প্যাটেণ্ট ওষুধ ও টনিকের ছড়াছড়ি। কোম্পানির ডাক্তার বাড়ি বয়ে গিয়ে ওষুধ দিয়ে আসেন। খোদার কসম, এর একটা কথাও ঝুটা নয় হুজুর। কোম্পানির ডাক্তার আমাদের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, আর কোম্পানির ওষুধ পাচার করে বেনামিতে ওষুধের কারবার খুলেছে—একথা কে না জানে হুজুর!"

ওষুধের কথা উঠিতেই অরুণ কথার মাঝখানেই প্রশ্ন করিল,—"তোর যে ছেলেটির অসুখের কথা শুনেছিলাম এখন ভাল হয়েছেতো রে ইয়াসিন?"

কথার মোড় ঘুরিয়া গেল। ইয়াসিন সকৃতজ্ঞভাবে উত্তর করিল,—"আজ গা'টা অনেক ঠাণ্ডা হয়েছে হুজুর। কলিমদ্দির মাকে আমি বলেছি বিবিজান কোম্পানির ডাক্তার দেখাইয়া তোমার পোলাটারে জ্যান্তে মাইরা ফেলাইও না, ছাওয়াল যদি তোমার হয় দেখবা অমনিই বাঁইচা উঠব।" বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া আসিল।

অরুণ পূর্বের ন্যায় অন্তরঙ্গতার সহিত ইয়াসিনের কাঁধেহাত রাখিয়া বলিল,—"তুই এখন তোর কাজে যা ইয়াসিন, রাত অনেক হয়েছে।"

বা-দিকের সরু গলিটা ধরিয়া অরুণ চিন্তিতভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। দুইটি গলির সংযোগস্থলে যে প্রাচীন বট-গাছটা অসংখ্য ঝুরি নামাইয়া একটা তাঁবুর ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই নিম্নে লণ্ঠনের আলোতে কে একজন সুর করিয়া তুলসী-দাসের রামায়ণ পড়িতেছে, আর তাহাকে ঘিরিয়া একদল ভক্তি-বিহ্বল নর-নারী একান্ত নিষ্ঠার সহিত রামায়ণ-গান শুনিতেছে। জীবনে যাহাদের কোন আনন্দ নাই, আকর্ষণ নাই—বাঁচিয়া থাকার সার্থকতা যাহারা খুঁজিয়া পাইল না, তাহারাই জীবনব্যাপী ব্যর্থতার গ্লানিকে, পুঞ্জীকৃত জড়ত্বকে ভক্তির-আবেশে ভুলিয়া থাকিতে চাহে। অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া অরুণ সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল।

অদূরে জীর্ণ চালা-ঘরটার মধ্য হইতে একটি ক্ষীণ আলোকের রেখা ঈষৎ উন্মুক্ত গবাক্ষপথে রাস্তার উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। সেদিকে তাকাইয়া অরুণ চমকিয়া উঠিল। কার্ত্তিক-শেষের

এই হিমেল রাতে সদর রাস্তার উপর আড়া-আড়িভাবে গোটা-পথ জুড়িয়া একখানা খাটিয়া পাতা রহিয়াছে। খাটিয়ার উপর কে একজন উবুর হইয়া শুইয়া আছে, আর একজন তাহার পার্শ্বে বসিয়া এক একবার প্রথমোক্ত ব্যক্তির গায়ের উপরেই অবশভাবে ঢলিয়া পড়িতেছে আবার মাঝে-মাঝে গায়ে-মাথায় হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গীতে কি যেন বলিতেছে। কৌতূহলী অরুণ রাস্তা হইতে নামিয়া গিয়া চালাঘরখানার আড়ালে দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি (উপবিষ্ট) প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে—"হ্যাঁরে খুব খেয়েছিস বুঝি—কেন অঁত খেলি বল্‌তো? এখন যে বেসামাল হয়ে পড়্‌লি!"

প্রথমোক্ত ব্যক্তি কনুইয়ে ভর দিয়া আর্ধোত্থিত অবস্থায়—"তুই আমাকে মাতাল বলছিস স্বরো? আমি মাতাল!......" বলিতে বলিতে ভেউ-ভেউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। পরক্ষণেই সজোরে বুক চাপড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—"গজানন মদ খায় কিন্তু মাতাল হয়না, বুঝলি স্বরো। তুইওতো খেয়েছিস, কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে ছাখ, আমি কত স্বাভাবিক কথা কইছি, কে বলবে আমি মদ খেয়েছি!......" কথা শেষ না হইতেই আবার মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথমোক্ত ব্যক্তির মাথায় হাত রাখিয়া—"তুই কেন মদ ধরেছিস্ বল্‌তো। লেখাপড়া শিখেছিস, নতুন বিয়ে করেছিস—বউয়ের নেশা এরই মধ্যে ছুটে গেল......হ্যাঁরে গজানন?" একটু থামিয়া টাল সামলাইয়া লইয়া পুনরায় বলিল,

"Bravo! সাবাস গজানন! তোর তত্ত্বজ্ঞান হয়েছে রে! বউ দুদিনের, মদ সারা জীবনের বন্ধু! আমাকে দেখছিস—আমার বাপ-দাদা চোদ্দপুরুষ মদ খেয়ে মানুষ, মদের পিপের মধ্যেই আমার জন্ম। বউ বেঁচে থাকতে হাতে-পায়ে ধরে কতো কান্নাকাটি করতো। কুছপরোয়া নেই! বউয়ের কথায় কান দিলে জীবনের সব আনন্দই মাটি হয়ে যাবে রে!" লিভারের ব্যথায় আর্ত্তনাদ করিয়া সুরপতি কুক্ষি চাপিয়া ধরিল।

গজানন—"বাংলা-মদ খেয়ে আমারও পেটে চড়া পড়ে গেল। তোর দৌলতে আজ বিলিতি-মদ খেয়ে কেমন ফুরফুরে নেশা হয়েছে বলতো সুরো!"

সুরপতির গলা জড়াইয়া ধরিয়া সুর করিয়া কহিল—"নেশার হাওয়ায় আমরা দুজনে, উড়ে চলেছি কোন ফুলবনে··· হাজরা সাহেবকে বলে তুই আমার একটা চান্স করে দে সুরো, তোকে জন্ম-জন্ম মনে রাখবো। বউটা বছর-বছর বিয়োচ্ছে—সংসার চালাতে পাচ্ছি নে। তাইতো সব ভুলে থাকবার জন্য মদ ধরেছি—তাতেও রেহাই নেই!······ছেলে-বউয়ের কান্নায় মদের নেশাও ছুটে যায় রে! মাইরি বলছি সুরো······হাজরা সাহেবকে বলে তুই আমার একটা হিল্লে করে দে, ছেলের মাথায় হাত রেখে বলছি—আমি মদ ছেড়ে দেব······।"

গজানন সুরপতির দুইটি হাত জড়াইয়া ধরিয়া কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

গজাননের কথায় অরুণের মন সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিল।

অধিকাংশ মানুষ জীবনে দুঃখ-কষ্ট, অপমান ও লাঞ্ছনার হাত হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্যই হয় ভক্তির আবেশে ডুবিয়া থাকিতে চাহে, নয়তো মদের নেশায় চুর হইয়া সাময়িক আত্মবিস্মৃতির কোলে আত্মসমর্পণ করে।

সুরপতি হাত ছাড়াইয়া লইয়া গজাননকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল,—"তুই ভাবিসনি গজানন। হাজরা সাহেব আমার হাতের মুঠোয়—তোকে আমি কারখানায় ঢুকিয়ে দেবই। তবেই আমার নাম সুরপতি।......কলেজ গার্ল, কচিমাল, তাতে আবার রূপে যেন উর্ব্বশী!...এ্যায়সা টোপ ফেলেছি, বাছাধনকে গিলতেই হবে।" উত্তেজনায় সুরপতি উঠিয়া দাঁড়াইল।

আর এভাবে লুকাইয়া থাকা সমিচীন হইবে না মনে করিয়া অরুণ সম্মুখের দিকে পা বাড়াইল।

সন্ধ্যা হইতে এতটা রাত্রি পর্য্যন্ত পর পর এতগুলি অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়িয়া অরুণের মনটা যার-পর-নাই খারাপ হইয়া গেছে। শিল্পোন্নতির জিগির তুলিয়া জাতীয়-সম্পদ ও উৎপাদন-বৃদ্ধির দোহাই দিয়া এই পুঁজিপতিদের শোষণ ও দুর্নীতি আর কতদিন চলিবে? একটা জাতির উন্নতির অর্থ মুষ্টিমেয় লোকের সুখ-সমৃদ্ধি নয়—এতগুলি লোককে অধঃপতনের মুখে ঠেলিয়া দিয়া কোন জাতিই উন্নত হইতে পারে না। ইহাদের তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে জাতির শিল্প-সভ্যতা পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে—ইহাদের ভারে গোটা-জাতটাই অধঃপতনের অতলে তলাইয়া যাইবে।

এইমাত্র কারখানার ওয়েলফেয়ার অফিসার মিঃ উপানন্দ

হাজরার সহিত যে কুৎসিত-ব্যাপারের সংশ্রবের কথা নিজের কানেই শুনিয়া আসিল তাহা কি সম্ভব? এতবড় একটা দায়িত্বপূর্ণ পদের অধিকারী ব্যক্তি এইরূপ পৈশাচিক জঘন্য কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারে? এই সুরপতি নামের লোকটি কে? মিঃ হাজরার সহিত তাহার কিসের এত ঘনিষ্টতা? কয়েক মাস আগের একটা ঘটনা তাহার মনে উদয় হইল। একটিমাত্র ঘটনা তাহার জীবনকে যে কতখানি প্রভাবিত করিয়াছে, ভাবিলে অরুণ আজও বিস্মিত না হইয়া পারে না। সেদিন রমার মুখে তাহার কোন এক ভগিনীপতির সম্বন্ধে ঠিক এই ধরণের অভিযোগ শুনিয়াছিল। যতদূর স্মরণ হয় তাহার নামও তো ছিল সুরপতি। এবং অরুণ ইহাও শুনিয়াছিল, রমার সেই ভগিনীপতিটি তাহাদের কারখানাতেই শ্রমিকের কাজ করে।

অরুণ কি ভাবিয়া ড্রাইভারকে গাড়ি লইয়া বাড়ি ফিরিতে নির্দ্দেশ দিয়া সুরপতির গৃহের দিকে পা বাড়াইল। অরুণ যেস্থান হইতে সুরমাকে তুলিয়া লইয়াছিল, এখান হইতে সে স্থানটির দূরত্ব খুবই কম। তাহারই আশেপাশে সুরপতির গৃহ খুঁজিয়া বাহির করিতে নিশ্চয়ই অরুণের তেমন কষ্ট হইবে না। এইমাত্র তাহার মন দুশ্চিন্তার যে দুর্ব্বহভারে পীড়িত হইতেছিল তাহা মুহূর্ত্তে হাল্‌কা হইয়া গেল। কতকগুলি আপোগণ্ড শিশু রাখিয়া হাসপাতালে সুরমার মৃত্যু হওয়ার সংবাদ ও মা-হারা ছেলে-মেয়েগুলির রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত রমার মায়ের আগমনের কথা সে শুনিয়াছিল। রমাও যদি কোন উপলক্ষে এখানে আসিয়া থাকে।

প্রত্যাশায় উন্মুখ মন লইয়া অরুণ-টালির ছাউনি দেওয়া ভগ্নপ্রায় ঘরখানির দরজায় মৃদু করাঘাত করিতেই রমা লণ্ঠন লইয়া ধীরপদে আসিয়া সাবধানে দরজা খুলিয়া দিল। সম্মুখে একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে অরুণকে দেখিতে পাইয়া রমা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল।

দীর্ঘকায় বলিষ্ঠদেহ সৌম্যদর্শন যুবকটিকে চিনিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু স্যার মৃগাঙ্ক সান্ন্যালের ভাবী উত্তরাধিকারী ও জামাতা প্রভূত সঙ্গতিশালী অরুণ চৌধুরী যে এই জীর্ণ-কুটিরে পদার্পণ করিতে পারে ইহা বিশ্বাস করা সহজ নহে। একদিন যৌবনোচিত ঔদার্য্য ও মহানুভবতায় অরুণ পীড়িতা নির্য্যাতিতা সুরমাকে হাসপাতালে স্থানান্তর করিতে সাহায্য করিয়াছিল—সুরমার হতভাগ্যের কথা, সুরমার সংসারের দুঃখ-দৈন্যের কথা রমা সেদিন কথা-প্রসঙ্গে অরুণকে খুলিয়া বলিয়া-ছিল সত্য, কিন্তু নিজের জীবনে অভাব ও দারিদ্র্যের সহিত যাহার কোনদিনই পরিচয় হয় নাই, অন্যের মুখে শোনা অপরের দুঃখ-কষ্টের বিরক্তিকর কাহিনী তাহার মনে স্থায়ী দাগ কাটিবার কথা নহে। দরিদ্রের জীবন সম্বন্ধে ধনীর আগ্রহ ও কৌতূহল সাময়িক ভাবাবেগ ছাড়া আর কি হইতে পারে? মুহূর্ত্তের দুর্বলতায় অরুণের নিকট রমা অসঙ্কোচে সুরমার হতভাগ্য-জীবনের গোপন ইতিহাস প্রকাশ করিয়া দিয়াছে—এই নির্লজ্জ মূঢ়তার জন্য রমা এতদিন নিজেকে অহরহ তিরস্কৃত করিয়াছে। যাহাদের নিকট দুঃখ-তাপ-ক্লিষ্ট নিপীড়িত নিঃস্ব জীবনের এককড়িও মূল্য নাই, দুঃখের কথা শুনাইয়া তাহাদের

সহানুভূতি নিষ্ফল চেষ্টার মত লাঞ্ছনা বোধ করি সংসারে আর কিছুতেই নাই।

তাই দ্বারদেশে অরুণকে আবিষ্কার করিয়া রমার সহসা বাক্যস্ফূর্তি হইল না। অরুণকে ভিতরে লইয়া আসিবে কি তাহার আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিয়া দ্বারদেশ হইতেই বিদায় দিবে—এই সমস্যাও তাহার মনে জাগিল। কেননা গৃহে অরুণের উপযুক্ত অভ্যর্থনাতো দূরের কথা তাহাকে সসম্মানে বসিতে দিবার মতো একখানি আসন পর্য্যন্ত নাই। রমা অনেক ভাবিয়াও এই সমস্যার কোন কূল-কিনারা করিতে পারিল না। নিঃশব্দে লণ্ঠনের আলোতে পথ দেখাইয়া দাওয়ায় তুলিয়া রমা একখানি ছিন্ন-অপরিছন্ন মাতুর বিছাইয়া অরুণকে বসিতে দিল। "এ বাড়িতে আপনার পায়ের ধূলি পড়বে, আমি ভাবতেই পারিনি"—রমা জোর করিয়া মুখের ভাবে একটু হাসি টানিয়া আনিয়া কহিল।

কালি-ঝুলি মাখানো চিমনিটার মধ্য দিয়া লণ্ঠনের মৃদু আলো বাহিরে ছড়াইয়া পড়িবার বড় একটা অবকাশ পায় না। রমার মুখের ভাব অরুণ লক্ষ্য করিল না। কিন্তু কথার শেল তাহাকে বিদ্ধ করিল। অপ্রতিহত হইয়া উত্তর করিল,—"পায়ের ধূলি অনেক আগেই পড়া উচিত ছিল রমাদেবী। আপনার দিদি যেদিন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় ফেলে হাসপাতালে ভর্তি হলেন, এখানে এসে খোঁজ-খবর করার কথা আমি সেদিন থেকেই ভাবছি, কিন্তু সময় করে উঠতে পারি নি, আপনি বিশ্বাস করুণ

রমাদেবী। তারপর সুরমাদির অকাল-মৃত্যুর খবরও আমি মনীষার কাছে জেনেছি। একান্ত ইচ্ছে ও আগ্রহ থাকা সত্বেও আমি আসতে পারি নি। যেজন্য আমি নিজেই যথেষ্ট লজ্জা বোধ করছি, সে কথা তুলে আপনি আমাকে আর অপ্রস্তুত করবেন না। আজও হয়তো আসা হতো না যদি না......থাক সে কথা। মা কোথায়, মাকে দেখছি না যে!"

অরুণের অনুনয়পূর্ণ-কথায় রমার মনের কুয়াশা কথঞ্চিত অপসৃত হইল। মায়ের সম্বন্ধে অরুণের জিজ্ঞাসায় যে আত্মীয়তার সুর ফুটিয়া উঠিল, উহাতে রমা মনে মনে খুশী না হইয়া পারিল না। মনোরমা জাগিয়াই ছিল। সুরমার কাঁদুনে ছোটছেলেটিকে পাশে শোয়াইয়া এইমাত্র নানাবিধ ছড়া কাটিয়া ঘুম পাড়াইতেছিল। মনোরমা আসিয়া দাড়াতেই অরুণ সসম্ভ্রমে উঠিয়া নত হইয়া তাহার পদধূলি লইল।

মনোরমা সস্নেহে অরুণের মাথায় হাত রাখিয়া আন্তরিক-ভাবে আশীর্ব্বাদ করিল। "এসো বাবা, রমার কাছে তোমার কথা আমি শুনেছি। সুরমার খবর তো জেনেছ। তুমি না থাকলে মেয়েটা বিনা চিকিৎসায় মারা যেতো। ভগবানই তোমাকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের জামায়ের ঘর-সংসারে তেমন আর মন নেই। এই সংসার ফেলে আমার তো দুদণ্ড বেড়োবার ফুরসত হয় না। তুমি বাবা একদিন মনীষাকে নিয়ে এসো। দুদণ্ডের দেখা কিন্তু ওর জন্যে মন আমার সারাক্ষণ কাঁদে।"

অরুণ বিনিতভাবে কহিল,—"মনীষার মুখে আপনার

কথাও আমি অনেক শুনেছি মা। আপনার শ্রীচরণ দর্শন করা আমার বহুদিনের সাধ ছিল। আজ আমার সে সাধ পূর্ণ হয়েছে।”

অরুণের পরোপকারিতা ও মহানুভবতার কথা শুনিয়া মনোরমার মন পূর্ব হইতেই তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিল, এখন অরুণের আন্তরিকতাপূর্ণ কথায় ও ব্যবহারে মনোরমার মাতৃ-হৃদয় তাহার প্রতি স্নেহে ও মমতায় একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। স্নেহসিক্ত-কণ্ঠে মনোরমা কহিল,—“দেশে যতদিন ছিলাম রমাই ছিল আমার একটি মাত্র মেয়ে। এখানে এসে মনীষার মতো লক্ষ্মী মেয়ে পেয়েছি তোমার মতো উপযুক্ত ছেলে পেলাম—সৌভাগ্য আমার! ঈশ্বর করুণ তোমরা চিরজীবি হয়ে থেকো।”

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মরোরমা পুনরায় কহিল,—“মা-মরা শিশুগুলিকে দেখা-শোনার ভার নিয়েছি—এভার আমাকে রইতেই হবে। পরীক্ষার পর বাধ্য হয়েই রমাকে এখানে এসে উঠতে হয়েছে। ফল বেরোনো পর্য্যন্ত না থেকেও উপায় নেই, দেশের সংগে সব সম্পর্ক তো চুকিয়ে দিয়েই চলে এসেছি। তুমি হয়তো জানোই না, দুঃখের মধ্যেই রমা আমার এত বড়টি হয়েছে, তাই ছোট সময় থেকে নিজের সম্মান ও মর্য্যাদা সম্বন্ধে ও সাধারণ মেয়েদের চাইতে একটু বেশী সচেতন। রমার জন্যেই যা একটু ভাবনা হয় বাবা।”

কথার মধ্যে বাঁধা দিয়ে রমা বলিয়া উঠিল—“অরুণ বাবুকে আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে মা?”

অরুণ পুনরায় পদধূলি লইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই মনোরমা কহিল,—"তুমি আমাকে মা বলে ডেকেছ অরুণ, তোমার কাছে আমার লুকোবার কিছু নেই। ছেলেকে একটু আদর-যত্ন করে বসিয়ে ছেলের মুখে ধরে দিতে পারি এমন কিছু আমার ঘরে নেই। এ দুঃখ মায়ের প্রাণে যে কতখানি বাজে তা তুমি বুঝবে না অরুণ। তোমাকে আদর-যত্ন করতে পারলাম না বলে তোমার এই দুঃখিনী-মায়ের প্রতি কোনো অভিমান রেখো না বাবা।"

অরুণকে সদর দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া দিবার জন্য মনোরমা নিজে লণ্ঠন হাতে লইয়া নামিয়া আসিল। অরুণ বিদায় লইয়া কয়েক পা যাইতে না যাইতেই অপর দিক হইতে সুরপতি টলিতে টলিতে আসিয়া সদর দরজায় চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইল। তাঁহার মুখ হইতে এক ঝলক ভোঁসকা গন্ধ ছুটিয়া বাতাসে ছড়াইয়া পড়িল। অরুণ ঘুণাক্ষরে টের না পায় এইভাবে মনোরমা সাবধানে সুরপতিকে ধরিয়া তৎক্ষণাৎ ভিতরে লইয়া আসিল।

মদির-বাতাসে মাতাল সুরপতির কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল "ও......কে গেলরে......! মিঃ অ...রু...ণ চৌ...ধুরী না? আ......মার চোখে......ধুলো......? মধুর লোভে আর... একটি অলিও দেখছি এসে জুটেছে। ভালোই হলো... আশাতীত ভালো...থ্রি চিয়ার্স্ ফর্ মি...সুরপতির বরাত খুলেছে—সেয়াণে সেয়ানে ঠোকাঠুকি বাঁধিয়ে দিয়ে সুরপতি দুদিক থেকেই দুহাতে লুটবে...থ্রি চিয়ার্স্ ফর্ মি।"

॥ বার ॥

"কি দাদা, এখনও তৈরি হচ্ছ না যে। আমায় নিয়ে যাবে না?" বলিতে বলিতে অরুণের ঘরে ঢুকিয়া মৃদুলা চেয়ারের হাতল ধরিয়া দাড়াইল। অরুণ শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক পাক্ষিকের পৃষ্ঠা হইতে দৃষ্টি তুলিয়া লইয়া বিরক্তির সুরে কহিল, "তোর কি সময় অসময় নেই মৃদুলা, কেন যখন-তখন জ্বালাতন করিস বলতো? আমি এখন কোথাও যাব না।"

• বারে, তুমি না নিয়ে গেলে আমি কার সংগে যাবো? বাবা তো সেই কখন চলে গেছেন। তুমি আবার যাবে না!—আমাকে সঙ্গে নিতে চাওনা তাই কেন বল্‌ছ না। এতটুকু সত্য কথা বলবার সাহস নেই তোমার! নাও ওঠো দেখি, এক্ষুণি তৈরি হয়ে নাও।" মৃদুলা অতর্কিতে অরুণের কোলের উপর হইতে ছোঁ মারিয়া কাগজখানি তুলিয়া লইল ও নিজেই দেরাজ হইতে দাড়ি-কামানোর সরঞ্জাম আনিয়া ড্রেসিং টেবিলে রাখিয়া দিল।

ভ্রাতা-ভগিনীর এই মধুর বাদানুবাদ উপভোগ করিতে অন্যদিনের মতো দয়াময়ী আজিও আসিয়া দাড়াইয়াছেন। দয়াময়ী আসিয়া উপস্থিত হইতেই মৃদুলা তাঁহাকে আব্দার করিয়া কহিল, "শুনেছো মা, মনীষাদি ও কলেজের আর সব মেয়েরা এবার পাস করে বেরিয়েছে, কলেজ থেকে আজ তাদের অভিনন্দন জানান হবে। আমাদের কলেজের সেরা এথ্‌লীট মিস্ মনীষা সান্যালকে খেলাধুলার দক্ষতার জন্য অনেকগুলো বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।"

অরুণের দিকে একবার আড় চোখে অর্থপূর্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মৃদুলা বলিয়া চলিল—"জ্যাঠামশাইতো অভিনন্দন-সভার সভাপতিত্ব করবেন। দাদা আমাকে কেমন কচি খুকী পেয়েছে দেখ মা, দাদা বলছে যাবে না। মনীষাদির অভিনন্দন-সভায় দাদা উপস্থিত থাকবেনা—এও তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বলো মা? আমাকে ধোকা দিয়ে ইনি একাই যেতে চাইছেন এই তো? তোমার ইচ্ছেটি খুলে বললেই পার বাছা!"

অরুণ কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া ক্ষৌরকার্য্যে নিযুক্ত রহিল। মৃদুলা কণ্ঠস্বরে গর্ব ও বিস্ময়ের ভাব ফুটাইয়া কহিল,—"তুমি কাগজে দেখনি দাদা, আমাদের কলেজ এবার কি ব্রিলিয়াণ্ট রেজাল্ট করেছে? মনীষাদিদের ক্লাসের একটি মেয়ে ইতিহাসে রেকর্ড-নম্বর পেয়ে ইউনিভার্সিটিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। মেয়েটি আবার মনীষাদিরই অন্তরঙ্গ বন্ধু—নাম রমা লাহিড়ী।" অরুণ ঘাড় বাঁকাইয়া একবার মৃদুলার দিকে চাহিল কিন্তু এবারেও প্রত্যুক্তি করিল না, তবে সে দ্রুত অভিনন্দন-সভার উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

অরুণকে নির্বাক দেখিয়া দয়াময়ী কথঞ্চিত চিন্তিতভাবেই প্রশ্ন করিলেন,—"হ্যাঁরে অরুণ, মনীষা আজকাল এ বাড়ীতে বড় একটা আসে না কেন রে?—তুই দেখা করিস তো? তোদের জ্যেঠামনির সংগে তোর কথা হয়? মনীষা পাশ করেছে শুনে আমার যে কত আনন্দ হচ্ছে। মেয়েটার উপর কী যে মায়া পড়ে গেছে আমার, একদিন না দেখলেই প্রাণটা আনচান করতে থাকে। ওকে তুই আজ সংগে করে নিয়ে আসবিতো অরুণ?"

দয়াময়ীর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া মৃত্তুলা সকৌতুকে কহিল—"এখন আর দেরী কেন মা, আদরিণী-মেয়েকে ছেলে-বৌ করে তোমার কাছে এনে রাখলেই পারো।" কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করিয়া পুনরায় কহিল—"তোমাদের অত আধিক্যেতা আমার সহ্য হয় না মা। কেবল মনীষা আর মনীষা, মনীষাদি তোমার ছেলে-বৌ হয়ে এলে যে আমার কথা তোমার মনেই পড়বে না মা!

মৃত্তুলার কথা শুনিয়া দয়াময়ী আসিয়া স্নেহভরে মেয়েকে কাছে টানিয়া আদর করিতে লাগিলেন। অরুণকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিলেন,—"শুন্‌লি, পাগলী মেয়ের কথা। হ্যাঁরে, আমার কথার কোন জবাব দিলি না যে অরুণ!"

অরুণ কাঠের আলমারির মধ্যস্থিত ষ্ট্যাণ্ড হইতে খুলিয়া দামী গ্যাবার্ডিনের কোটটা গায়ে চড়াইতে চড়াইতে মৃত্থ হাসিয়া কহিল,—"এক সংগে তুমি তো কতগুলো প্রশ্ন করলে মা, কোনটার আগে জবাব দিই বলো?"

এমন সময় ড্রাইভার গাড়ি বাহির করিয়া হাঁক দিতেই মৃত্তুলা ও অরুণ নীচে নামিয়া আসিল।

* * *

মৃত্তুলা ও অরুণ যখন আসিয়া উপস্থিত হইল তখন সভার কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। স্কুল কমিটির চেয়ারম্যান ও অভিনন্দন-সভার সভাপতি স্যার মৃগাঙ্ক সান্যাল তাঁহার প্রারম্ভিক বক্তৃতায় এদেশের স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাস ও জাতীয় গঠনে

নারীর ক্রমবর্দ্ধমান দায়িত্বের বিষয় বিবৃত করিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এই কলেজের ছাত্রীদের কৃতিত্বের জন্য আনন্দ প্রকাশ করিলেন। মঞ্চের সম্মুখে প্রথম সারিতে পরীক্ষোত্তীর্ণ বিদায়ী-ছাত্রীরা বসিয়াছিল, তাহার পেছনের বেঞ্চীতে মৃদুলা মনীষার ঠিক পশ্চাতেই নিজের স্থান করিয়া লইল।

সভাপতির প্রারম্ভিক-ভাষণের পর, কলেজের অধ্যক্ষা মিস্ মালবিকা দাস তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতার প্রসঙ্গে শিক্ষাবিস্তারে স্যার মৃগাঙ্ক সান্যালের অপরিসীম আগ্রহ, অতুলনীয় দান ও ত্যাগের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কলেজের ছাত্রীদের কৃতিত্বের কথা বলিতে গিয়া বাধ্য হইয়াই কর্তৃপক্ষও অধ্যাপিকাগণের অনুগৃহীতা অনাথিনী রমা লাহিড়ীর নামটাও উল্লেখ করিতে হইল। কিন্তু রমার প্রসঙ্গে ছাত্রীর নিজস্ব গুণপনার চেয়ে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের প্রতি কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট অধ্যাপিকাদের গুণগ্রাহিতার কথাই তিনি সাড়ম্বরে ঘোষণা করিলেন।

তাহার দীর্ঘ-বক্তৃতায় এক বৃহৎ অংশ জুড়িয়াই রহিল কলেজের পরিচালক-সমিতির চেয়ারম্যান ও বর্ত্তমান সভার সভাপতি শিল্পপতি দানবীর স্যার মৃগাঙ্ক সান্যালের কন্যা মনীষার প্রশংসা ও সুখ্যাতি। খেলাধুলায়, নৃত্যগীতাদি, কলাবিষয়ে ও সকলপ্রকার সংগঠনমূলক কার্য্যে মনীষার অসামান্য নৈপুণ্যের কথা তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। শহরের শ্রেষ্ঠ ধনী-পরিবারের কন্যা হইয়াও মনীষা তাঁহার অনাড়ম্বর-জীবনযাত্রা,

নিরহঙ্কার ও অমায়িক-ব্যবহারের জন্যই ছোট-বড় সকলের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছে। কলেজের অধ্যক্ষা মিস্ মালবিকা দাসের এই উক্তির মধ্যে যে সত্যতা নাই তাহা নহে। কিন্তু তাঁহার বলিবার ভঙ্গীটি এমনই যে সত্যভাষণের চেয়ে কন্যার সুখ্যাতি করিয়া কন্যার পিতার মনস্তুটি সাধনের হীন অভিসন্ধিটাই অধিকতর প্রকট হইয়া উপস্থিত অনেকের বিরক্তি উৎপাদন করিতেছিল। মনীষার প্রসঙ্গ শেষ করিলেন তিনি এই বলিয়া যে, রমা লাহিড়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দ্বিতীয়স্থান অধিকার করিয়া যে গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে, সে গৌরব রমার সহিত মনীষারও প্রাপ্য। কেননা বাহিরের লোক না জানিলেও মনীষাই যে রমাকে সর্ববিষয়ে সাহায্য ও আনুকূল্য করিয়া দিয়া এই গৌরবের অধিকারিণী করিয়াছে তাহা কলেজের পরিচালক, অধ্যাপিকা ও ছাত্রীদের কাহারও অবিদিত নহে। বিদায়ী-ছাত্রীদের উত্তোরত্তর উন্নতি ও সুখ-সৌভাগ্য কামনা করিয়া তিনি তাঁহার বক্তৃতা সমাপ্ত করিলেন।

মনীষার পার্শ্বেই বসিয়াছিল রমা। অধ্যক্ষা মিস্ মালবিকা দাসের লজ্জাস্কর উক্তিতে মনীষা লজ্জায় যেন মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিল। একবার ইচ্ছা হইল রমার নিকট হইতে ছুটিয়া পলাইয়া যায়, কিন্তু তাহাতে রমা অধিকতর ক্ষুণ্ণ হইতে পারে ভাবিয়া সে একথা-ওকথা নানা গল্প-গুজবে ভুলাইয়া মিস্ মালবিকা দাসের বক্তৃতা হইতে রমার মনোযোগ সরাইয়া লইবার জন্যই সর্বদা সচেষ্ট রহিল।

কলেজের অধ্যক্ষার মুখে মনীষার প্রশংসা শুনিয়া অরুণ বেশ

খুশীই হইল কিন্তু রমার কৃতিত্বকে লঘু করিয়া দেখাইবার এই জঘন্য প্রয়াস তাহাকে ততোধিক ব্যথিত করিল। রমা দরিদ্র ও সহায়-সম্বলহীনা বলিয়াই তাঁহার কৃতিত্ব স্বীকার করিতেও এতখানি কুণ্ঠা! শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও রজত-কৌলিন্যের এই অবাঞ্ছিত প্রাধান্য দেখিয়া অরুণ মর্মাহত হইল। অরুণের মনে হইল কলেজ-কর্তৃপক্ষের এই অবহেলা ও তাচ্ছিল্যই রমার কৃতিত্বকে যেন অধিকতর গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছে।

প্রিন্সিপাল মিস্ মালবিকা দাসের বক্তৃতা শেষ হইলে সভাপতি স্যার মৃগাঙ্ক সান্যাল টেবিলের উপর স্থাপিত একটি তালিকাদৃষ্টে পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত-ছাত্রীদের একে একে আহ্বান করিয়া পুরস্কার প্রদান করিলেন। প্রথমেই মিস্ রমা লাহিড়ীকে ডাকিয়া সভাপতি মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তাঁহার সাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া বলিলেন—"আজকের এই অনুষ্ঠানের লক্ষ্য মিস্ রমা লাহিড়ী। রমার মত মেয়ে, যে কোন কলেজের গৌরবস্বরূপ। তাহার ন্যায় একজন মেধাবী ছাত্রীকে পেয়ে আমাদের কলেজ ধন্য হয়েছে। তার কৃতিত্বে আমরা প্রত্যেকে গৌরব বোধ কচ্ছি! আমাদের দেশে লীলাবতী ও খনা উভয়েই ভারতীর মতো ধীশক্তিসম্পন্না মেয়ে আবার জন্মাবে আজ এই ভরসা করে আমরা এখান থেকে ফিরে যাব।"

অধ্যক্ষা মিস্ মালবিকা দাস নত হইয়া অপ্রসন্নমুখে পুরস্কারের বাণ্ডিলগুলি নাড়াচাড়া করিতেছিলেন। রমা কৃতজ্ঞ-চিত্তে বৃদ্ধের পদধূলি লইল। স্যার মৃগাঙ্ক সান্যাল সস্নেহে

তাঁহার হস্ত স্থাপন করিয়া আশীর্বাদ করিলেন ও প্রিন্সিপাল মিস্ মালবিকা দাসের নিকট হইতে বইয়ের বাণ্ডিলটি গ্রহণ করিয়া রমা অঞ্জলিবদ্ধ-হস্তে তুলিয়া লইলেন। সভাপতি স্যার মৃগাঙ্ক সান্যালের এই উক্তিতে মনীষা উৎফুল্ল হইল, তাহার মনের সমস্ত সঙ্কোচ ও গ্লানি দূরীভূত হওয়ায় প্রসন্ন-হাস্যে তাহার কমনীয় মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু মেঘমেদুর আকাশে বিদ্যুৎদীপ্তির ন্যায় তাহা পরক্ষণেই মিলাইয়া যাইতে বিলম্ব হইল না।

আন্তঃ-কলেজীয় ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী হিসাবে মনীষা একটি প্রকাণ্ড কাপ উপহার পাইল এবং প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে জয়লাভ ও নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য একাধিক পুরস্কার পাইল।

প্রথম প্রথম মনীষা পুরস্কারের ট্রফিটা হাসিতে হাসিতে আসিয়া রমার হাতে তুলিয়া দিত কিন্তু ক্রমেই ইহার মধ্যে একটা ইচ্ছাকৃত অশোভন বাড়াবাড়ির পরিচয় পাইয়া সে অতিশয় কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। ক্রীড়া-কুশলতা, জেনারেল প্রফিসিয়েন্সি, এ্যাটেনড্যান্স ও সদাচরণের জন্য মনীষা বহু মূল্যবান পুরস্কার পাইল। ইহার তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় দ্বিতীয়স্থান-অধিকারিণী রমার পুরস্কার এতই অকিঞ্চিতকর যে তাহা লইয়া উপস্থিত জনতার মধ্য হইতে মৃদু গুঞ্জন উত্থিত হইতে শোনা গেল। মনীষা পুরস্কারের বোঝাটি লইয়া অপ্রসন্নমুখে একপাশে সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল—রমার পার্শ্বে নির্দিষ্ট স্থানটিতে ফিরিয়া যাইতে তাহার লজ্জাবোধ হইল।

মনীষার এই কুণ্ঠিতভাব লক্ষ্য করিয়া রমা ব্যথিত হইল—কর্তৃপক্ষের আচরণের বৈষম্যের জন্য মনীষার কি দায়িত্ব থাকিতে পারে, তাহা ছাড়া পাঠ্যপুস্তক-বহির্ভূত বিষয়ে মনীষার উৎকর্ষ ও যোগ্যতা সম্বন্ধেতো কোনই সংশয়ের অবকাশ থাকিতে পারে না। মনীষার আচরণে রমার মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয় পাইল।

সভান্তে বিরাট সভামণ্ডপ যখন প্রায় শূন্য হইয়া। আসিয়াছে, রমা মনীষাকে সাদর-সম্ভাষণ জানাইল। মনীষা সাগ্রহে রমাকে জড়াইয়া ধরিয়া রমার কাঁধের উপর মস্তক স্থাপন করিয়া অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বহুদিন পরে আবার দুই অভিন্নহৃদয়-সখী চোখের জলে সমস্ত ক্ষোভ ও গ্লানি মুছিয়া ফেলিল।

অরুণ অদূরে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ এই দৃশ্য উপভোগ করিল। একটু আগে কলেজ-অধ্যক্ষার বক্তৃতা ও পুরস্কার বিতরণের মধ্যে যে হীন-পক্ষপাতিত্বের পরিচয় পাইয়াছে, তাহাতে তাহার মন এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হইয়া উঠিতেছিল। কর্তৃপক্ষের বৈষম্যমূলক আচরণও যে ইহাদের তরুণ-প্রাণে এতটুকু কালিমা লেপন করিতে পারে নাই, দুইটি হৃদয়ের প্রীতি-বন্ধন বিন্দুমাত্র শিথিল করিতে পারে নাই, ইহাতে অরুণ অনেকখানি আশ্বস্ত হইল।

অরুণ অগ্রসর হইয়া উভয়ের অলক্ষ্যে মনীষার পার্শ্বে আসিয়া দাড়াইল। মৃদুলাও অরুণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে-ছিল। ক্ষিপ্রপদে আগাইয়া আসিয়া সোল্লাসে কহিল, "এসো দাদা, রমাদির সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।"

রমা চমকিত হইয়া অপ্রতিভাবে দুইহাত তুলিয়া অরুণকে নমস্কার জানাইল। অরুণ প্রতিনমস্কার করিয়া কহিল, "আপনার কৃতিত্বকে লঘু করে দেখাবার চেষ্টা আপনার সাফল্যকে আরও গৌরবময় করে তুলেছে রমাদেবী। নিঃসহায় ও গরীব বলে যোগ্যতার প্রাপ্য সম্মান দিতে যারা কুণ্ঠিত, লোকশিক্ষার ভার তাদের হাতে থাকা দেশের পক্ষে কখনই কল্যাণের নয়।"

অরুণের এই কথায় মুহূর্ত্তে মনীষার সহাস্য মুখে কে যেন এক-পোঁচ কালি মাখাইয়া দিল। রমার প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের অনুচিত ব্যবহারে সে নিজেকেই অপরাধী মনে করিয়া মর্মাহত হইয়াছিল। রমার সহৃদয়তায় বিমর্ষভাবটা যখন কাটাইয়া উঠিয়া মনীষা স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে অরুণের স্পষ্টভাষণে কাটাঘায়ে নুনের ছিটার ন্যায় তাহার ক্ষতস্থানে তীব্র জ্বালা ধরাইয়া দিল। মনীষা ক্ষুণ্ণমনে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল।

রমা সকৌতুকে মনীষার হাত হইতে পুরস্কারের প্যাকেটগুলি লইয়া অরুণকে দিতে গেলে মনীষা অভিমানক্ষুব্ধ গলায় বলিয়া উঠিল—"রেখে দে রমা, আমার পুরস্কার পাওয়াটা ওর হয়তো মনঃপূত হয়নি।"

রমা কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। অরুণ ব্যাথিতকণ্ঠে উত্তর করিল—"এ তোমার অভিমানের কথা মনীষা। তোমার পুরস্কারপ্রাপ্তিতে আমি খুসী হইনি, একথা বললে আমার উপর অবিচারই করা হবে। শিক্ষার উদার ও অপক্ষপাত আবেষ্টনে দারিদ্র্যকে যারা অপরাধ ও অযোগ্যতা বলে গণ্য করে,

আমার অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে। জাতি ও চরিত্রগঠনের মহাদায়িত্ব যাদের উপর ন্যস্ত হয়েছে, কাঞ্চনকৌলিন্যের কাছে তারা যদি আত্মবিক্রয় করে বসে থাকে, তাদের সম্বন্ধে তোমার মনেও ঠিক এতখানি অভিযোগ থাকাই উচিত মনীষা।”

মনীষার অভিমানহত-চিত্তে যুক্তির প্রলেপে কোনই ফল হইল না ; বরং দ্বিগুণ উত্তেজিত হইয়া মনীষা এক ঝটকা মারিয়া অরুণের হাত হইতে প্যাকেটগুলি মাটিতে ছড়াইয়া ফেলিয়া হন-হন করিয়া চলিয়া গেল।

রমা অপ্রস্তুত হইয়া অরুণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, “না অরুণবাবু, এমনি করে মনীষাকে চটানো আপনার উচিত হয় নি। আমিতো জানি ওর মন কত উঁচু, ও নিজেই লজ্জিত হয়েছিল। আপনি ওকে অযথা আরও দুঃখ দিলেন। তাছাড়া আমার প্রসঙ্গ নিয়ে আপনাদের দু’জনের মধ্যে এতটুকু মনোমালিন্য হয় এ আমি সত্যই চাই না অরুণবাবু। আমি আজ মনীষার মনঃকষ্টের কারণ হয়ে রইলাম এ দুঃখ আমার যাবে না,—আজকের দিনের সব আনন্দ ও সকল গৌরবকে ছাপিয়ে এই বেদনাই আমার মনে চিরকাল জেগে থাকবে। আপনি যান অরুণবাবু, মনীষাকে শান্ত করুণগে।”

মনীষার এই অপ্রত্যাশিত ভাবান্তর দেখিয়া অরুণ নিজেও হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিল। অরুণ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ক্ষিপ্রপদে মনীষাকে অনুসরণ করিল। ভূলুণ্ঠিত প্যাকেটগুলি সযত্নে তুলিয়া মৃদুলা নিঃশব্দে প্রস্থান করিল।

॥ তের ॥

কারখানার ছুটির পর সেদিন সায়াহ্নে ওয়েলফেয়ার অফিসার মিঃ হাজরা নিজ চেম্বারে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ ফাইল খুলিয়া নিবিষ্টমনে পড়িতেছিলেন। দরজার দিকে একেবারে প্রাচীর ঘেষিয়া দাঁড়াইয়াছিল আয়রণ ফাউণ্ড্রির চার্জম্যান ইয়াসিন সর্দ্দার। মিঃ হাজরা এক একবার ফাইল হইতে মুখ তুলিয়া ইয়াসিনের দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রাগতভাবে উচ্চৈঃস্বরে কি বলিতেছিল। শ্রমিকদের অধিকাংশই, ছুটির পরে কারখানা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কেবল কিছুসংখ্যক লোক অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য রহিয়া গিয়াছে।

মিঃ হাজরা ইয়াসিনের মুখের উপর রক্তচক্ষু স্থাপন করিয়া কুপিত হইয়া কহিল,—"মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে ফল হবে না ইয়াসিন, কোনো ওজর-আপত্তিই আমি শুনব না, হয় কালই তুমি উড়িষ্যায় আমাদের ষ্টিল-প্ল্যাণ্টে কাজের জন্য রিপোর্ট করবে, নয়তো তোমার পাওনা মিটিয়ে নিয়ে কালই তুমি রিজাইন দিয়ে চলে যাবে। দুষ্ট গরু থাকার চেয়ে শূন্য গোয়ালই আমি দেখতে চাই।"

ইয়াসিন কাঁদিয়া মিঃ হাজরার পাদুইটি জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "হুজুর গরিবের মা-বাপ। দয়া কইরা আর দুইটা মাস আমাদের এইখানে থাকতে ছান হুজুর, ইয়াসিন আপনার কেনা গোলাম হইয়া থাকবো, না হয় কাজের থিকা ছাড়াইয়া দিবেন। দুইমাস পরে আমারে যেইখানে ইচ্ছা পাঠাইয়া দিবেন।

দশমাস-পোয়াতি বিবিটারে টানা-হেঁচড়া করলে ছেলে মারা পড়ব। আমারে আর দুইটা মাস সময় ছান হুজুর"।

মিঃ উপানন্দ হাজরা ইহাকে মিথ্যা অজুহাত মনে করিয়া ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া তিনি তারস্বরে গর্জন করিয়া উঠিলেন, "তোদের মায়া-কান্না আমি ঢের শুনেছি ইয়াসিন। বেইমানদের আমার চিনতে বাকী নেই। তোর মত যেক'টা নেমকহারাম আছে একে একে এখান থেকে তাড়াব, তবে আমার নাম উপানন্দ হাজরা।"

আবেদন-নিবেদন নিষ্ফল হইবে বুঝিয়া ইয়াসিন সর্দ্দার বাহির হইয়া আসিল। এই শক্ত-মানুষটার চোখেও দুই ফোঁটা জল টলমল করিতে লাগিল।

মিঃ হাজরা একবার দরজার বাহিরে আসিয়া এদিক-ওদিক তাকাইয়া দেখিয়া ডাকিল, "সুরপতি"। পার্শ্বের কক্ষ হইতে সুরপতি নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিয়া মিঃ হাজরার পার্শ্বে একখানি টুলের উপর বসিল। মিঃ হাজরা নির্বানোন্মুখ পাইপটাতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া দেরাজের মধ্য হইতে একটা সিগারেট ও দেশলাই বাহির করিয়া সুরপতির দিকে আগাইয়া দিল।

মিঃ উপানন্দ হাজরা সুরপতির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া অনুচ্চস্বরে কহিল,—"তুমি যার কথা বলেছিলে তোমার সেই শ্যালিকাটিই নাকি এবার য়ুনিভার্সিটিতে সেকেণ্ড ক্লাস পেয়ে বি এ পাস করেছে? সেদিনকার সভাতে আমিও উপস্থিত

ছিলাম। বেশ খাসা মেয়ে বটে।” মিঃ হাজরা অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইয়া ফিসফিস করিয়া বলিল, “তা হলে কবে নিয়ে আসছো স্মরপতি ?

আয়রন-ফাউণ্ড্রির চার্জ্জম্যান ইয়াসিনকে আমি এখান থেকে ট্রান্সফারের নোটিশ দিয়ে দিয়েছি। কালথেকে তুমিই চার্জ্জম্যানের পোষ্টে কাজ করবে। এন্‌গেজমেণ্টটা পাকা হয়ে গেলে তুমি বসবে ফোরম্যানের চেয়ারে, বুঝেছ স্মরপতি! মিঃ হাজরা সানন্দে স্মরপতির পিঠ চাপড়াইয়া দিয়া কহিল, “উপানন্দ হাজরার যে কথা সেই কাজ। দেখো স্মরপতি এসব ব্যাপার যেন কেউ ঘুনাক্ষরেও টের না পায়। তোমার অমত না থাকেতো তোমার শ্যালিকাটিকে আমি অফিসেও আমার প্রাইভেট-সেক্রেটারী করে রাখবো—তার মাইনে থেকে প্রতিমাসে একশোটি টাকা গুনে তোমার হাতে তুলে দেব।”

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মনোহরচিত্র স্মরপতির চোখের সামনে আসিয়া উঠিতেই চতুর স্মরপতির মাথায় মুহূর্ত্তে আর একটি দুষ্টবুদ্ধি খেলিয়া গেল। সাহেব যখন টোপ গিলিয়াছে তখন একটু খেলাইয়া লইতে দোষ কী। বিশেষতঃ দুই প্রধানে রেষারেষি বাঁধাইয়া দিলে দরটা চড়িয়া যাইবারই সম্ভবনা।

মওকা যখন মিলিয়াছে স্মরপতি ভাল করিয়াই দাঁও মারিবে। স্মরপতি সাবধানে কথাটা পারিল, “মধু ছড়ালে মৌমাছির অভাব হয় না হুজুর। এরই মধ্যে অনেক ভোমরা ভন্ ভন্ করতে আরম্ভ করেছে।” মিঃ হাজরার কাণের কাছে মুখ লইয়া স্মরপতি চুপি চুপি বলিল, “আপনাকে বলবো কি হুজুর

ছোট সাহেবেরও নজর লেগেছে। এই সেদিন রাত্রিবেলা নিজের চোখে ছোট সাহেবকে আমার বাসার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম।" হাজরা সাহেবের উপর এই কথার কি প্রতিক্রিয়া হয় লক্ষ করিবার জন্যই সুরপতি একটু থামিল।

মিঃ হাজরা চিন্তিতমুখে পাইপ টানিতে লাগিলেন। তামাকের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া উপরে উঠিতে লাগিল। তাহার বলিরেখাযুক্ত-ললাটে গভীর উদ্বেগের ছায়াপাত হইয়াছে, ক্রমে তাহার চিন্তাক্লিষ্ট মুখে হিংস্রতার আভাস ফুটিয়া উঠিল। অরুণ যেদিন হইতে শিল্পপতি স্যার মৃগাঙ্ক সান্যালের প্রতিভূ হিসাবে কারখানার কার্য্য-পরিচালনায় বহাল হইয়াছে, সেইদিন হইতেই উপানন্দ হাজরার মনে অরুণের প্রতি উৎকট-বিদ্বেষ জমা হইতেছিল। আজ সুরপতির অভিসন্ধিপূর্ণ উক্তি তাহাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় কাজ করিল।

উপানন্দ হাজরার মুখের গ্রাস কেড়ে নেয় এমন সাধ্য কারও নেই। অরুণ চৌধুরী যদি আমার লক্ষ্য-পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, অরুণ চৌধুরী থাকবে কি আমি থাকব—এ কারখানায় দুজনের একসংগে স্থান হবে না সুরপতি, এ তুমি ঠিক জেনো।"

প্রবল উত্তেজনায় তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দুইহাত পশ্চাতে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মিঃ উপানন্দ হাজরা কক্ষমধ্যে পায়চারী করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেল।

মিঃ হাজরার বেদনার্ত্ত মুখের উপর দিয়া সহসা হাসির একটু

ক্ষীণ রেখা ফুটিয়া উঠিল। "অরুণ চৌধুরীর মৃত্যু-যন্ত্র আমার জানা আছে সুরপতি। স্যার মৃগাঙ্ক সান্যালের কাণে যদি তার ভাবী-জামাতার এসব কীর্ত্তির কথা একবার তোলা যায় তবে আর বাছাধনকে করে খেতে হবে না। স্যার মৃগাঙ্ক সান্যাল কন্যার বিয়েতে যৌতুক দেবে তার এই দেশজোড়া শিল্প-বাণিজ্য-সংস্থাগুলি। ছেলের চরিত্রদোষে এই বিপুল ধনসম্পদ যদি হাতের মুঠোর মধ্যে এসে ফসকে যায়, বৃদ্ধ পীতাম্বর চৌধুরী বুক চাপড়ে মরবে। এদের দুই সংসারে আমি আগুণ লাগিয়ে দেব সুরপতি। তাতেও যদি নিবৃত্ত না হয় অরুণ চৌধুরীর তপ্তশোনিতে অবগাহন করে গায়ের জ্বালা জুড়াবো। অরুণ চৌধুরীকে তুমি সাবধান করে দিও সুরপতি। ছলে-বলে-কৌশলে যে-করে পারি আমার পথের কাঁটা আমি উপড়ে ফেলবই।" মিঃ উপানন্দ হাজরা আলমারি খুলিয়া রঙ্গীন-কাগজে মোড়া একটা বড় বোতল বাহির করিয়া আনিয়া সুরপতির হাতে দিলেন।

॥ চৌদ্দ ॥

অনেক সময়ে মনের অবস্থা এমন হয় যে, কোনো কাজে উৎসাহ লাগে না, কোনো কিছুতেই আনন্দ পাওয়া যায় না, খাওয়া দাওয়া, কি সাজ-পোষাক, কি খেলাধুলা, কি গানবাজনা জীবনের অভিলষিত বস্তুগুলিও বিস্বাদ হইয়া যায় অথচ ইহার কোন নির্দ্দিষ্ট কারণই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কেমন একটা

অশ্বস্তি, নিরানন্দ, ও বিষণ্ণতা মনটাকে নিরন্তর পিষ্ট করিতে থাকে। মনীষার মনের অবস্থাও হইয়াছে আজকাল তাহাই। যে মনীষা সতত বিলাস-ব্যাসনে মসগুল হইয়া থাকিতে চাহিত, আনন্দ-আহ্লাদে নিরন্তর উচ্ছসিত হইয়া থাকিত, কোন ভোগ-বিলাসে আর তাহার কিছুমাত্র আসক্তি নাই। তাহার বিরস-মুখের পানে তাকাইয়া স্যার মৃগাঙ্ক সান্যাল উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠেন। ব্রেক্‌ফাষ্ট ও ডিনারের টেবিলে কন্যাকে বৈঠকী-আলাপে প্রবৃত্ত করিতে না পারিয়া পিতা মনে মনে বিষম শঙ্কিত হন। কন্যার মনোরঞ্জনের জন্য নিত্যই তিনি এক একটি প্রীতিকর-প্রসঙ্গের অবতারণা করেন, কিন্তু মনীষার অমনোযোগীতা ও ঔদাসীন্যের জন্যই তাহা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পায় না।

আর মনীষা নিজেও ভাবিয়া পায়না সকল বিষয়ে তাহার এই নিস্পৃহতা ও অনুৎসাহের কারণ কি। সত্য বটে অরুণের উপর তাহার দারুণ অভিমানই হইয়াছিল—তাহার প্রতি কলেজ-কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতদুষ্ট-আচরণ সম্বন্ধে অরুণের কঠোর ও অপ্রিয় সমালোচনার জন্যই এই অভিমান। কিন্তু কলেজ-কর্তৃপক্ষের ব্যবহারে সে নিজেওতো কম লজ্জিত হয় নাই। তবে কি অরুণের মন্তব্যে রমার প্রতি যে সমবেদনা ও সহানুভূতি ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহাই এই অভিমানের কারণ। কিন্তু যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ও পরিচালকগণ ধনিকের তাঁবেদারি ও মোসাহেবি করিতে ব্যগ্র, অরুণের মন্তব্য কেবল তাহাদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। ইহার সহিত ব্যক্তিগতভাবে রমারতো

কোনো সম্বন্ধই নাই—রমা না হইয়া আর কেহ হইলেওতো অরুণ ঠিক একই কথা বলিত।…অরুণ কি রমাকে ভালবাসে? মনীষার মাথায় নিশ্চয়ই কোন গোলযোগ হইয়াছে, না হইলে এমন অলীক ও অদ্ভুত সন্দেহ তাহার মনে জাগে কেমন করিয়া!
…সেদিন ফিরিবার পথে গাড়িতে অরুণের সহিত যে কথাবার্ত্তা হইয়াছে তাহাতেইতো সকল সন্দেহের নিরসন হইয়া গিয়াছে। বরং সে-ই পিতার মুখে একদিন অরুণের সহিত তাঁহার সামান্য মতভেদের কথা শুনিয়া অভিমানবশতঃ এতদিন অরুণের সহিত দেখাসাক্ষাত না করিয়া তাহার প্রতি রূঢ় ব্যবহার করিয়াছে। অরুণ যে ইহাতে কতখানি আঘাত পাইয়াছে তাহাও সেদিনের কথাবার্ত্তা হইতে মনীষা বুঝিতে পারিয়াছে। তাহার প্রতি অরুণের স্নেহ-ভালবাসা যে অটুট আছে, তাহাতে সংশয় প্রকাশ করিলে অরুণের প্রতি অবিচারই করা হইবে। বস্তুতঃ মনীষা তাহার এই সদা-বিষণ্ণ-স্বভাবের কোন সঙ্গত কারণই খুঁজিয়া পায় না। অবশ্য অরুণের উপর অভিমান করিয়া রমার সম্মুখ হইতে হটকারিতা করিয়া চলিয়া আসাটা অবিবেচনারই কাজ হইয়াছে। রমা ইহাতে মনক্ষুণ্ণ হইতে পারে। কিন্তু রমার সহিত দেখা করিয়া একদিন ক্ষমা চাহিয়া আসিলেই তাহা মিটিয়া যাইবে, রমার প্রতি অরুণের সহানুভূতিসূচক উক্তির জন্যই যে মনীষা বিসদৃশ ও অশোভন আচরণ করিয়া থাকিতে পারে, রমা নিশ্চয়ই তাহা মনে করে নাই, তবে আর এই ব্যাপার লইয়া মনের বৃথা আলোড়ন পুষিয়া রাখিবার কি কারণ থাকিতে পারে!

সেদিন পিতাপুত্রীর চায়ের-আসরে স্যার মৃগাঙ্ক সান্যাল প্রভাতী কাগজখানি খুলিয়া বসিয়াছিলেন। কাগজে স্নাতক পরীক্ষোত্তীর্ণদের মধ্যে প্রথমশ্রেণীর সরকারী-বৃত্তিপ্রাপ্তদের নামের-তালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। তালিকার উপরের দিকেই রমা লাহিড়ীর নামটি সন্নিবিষ্ট ছিল। স্যার মৃগাঙ্ক সান্যাল ঐ সংবাদটির প্রতি কন্যার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া কহিলেন—"তোমাদের কলেজের রমা লাহিড়ীতো শুনেছি তোমার বন্ধু। ওকে একদিন এখানে নিয়ে এসোতো মামণি। মেয়েটির সঙ্গে একটু আলাপ করবো। ঠিক পথে চালিয়ে দিতে পারলে ও উপযুক্ত ক্ষেত্র পেলে ওর মতো মেধাবী মেয়ে যে দেশের একটি অমূল্যসম্পদ তৈরী হবে তাতে কোন ভুল নেই মা। রমা যদি উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যেতে চায়, আমি ওর সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতে রাজী আছি—একথা তুমি ওকে জানিয়ে দিও।"

রমার সম্বন্ধে মনীষার মনে গৌরববোধের অন্ত ছিল না। সে যে কেবল রমার কৃতকার্য্যতায় সর্বপ্রকারে সহায়তা করিয়াছে তাহাই নহে; রমার মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করিতে, রমাকে নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে সচেতন করিতে তাহার চেষ্টার বিরাম ছিল না।

রমা স্বভাবতঃই অন্যের অনুগ্রহ ও সাহায্যগ্রহণে একান্ত পরাঙ্মুখ না হইলে মনীষা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তাহার ধনাঢ্য পিতার নিকট অনুরূপ প্রস্তাব উত্থাপিত করিত। তাই এ প্রস্তাবে রমা সম্মত হইবে কিনা সে বিষয়ে সন্দিহান হইলেও

পিতার আগ্রহের পরিচয় পাইয়া মনীষা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বেশ কিছুদিন পরে এই প্রথম মনীষার মুখে ম্লান-হাসি ফুটিল।

সরাসরি জবাব না দিয়া স্বাভাবিক পরিহাসপ্রিয়তার সহিত মনীষা পাল্‌টা অভিযোগ করিল, "বাবা, তোমার উচ্চশিক্ষা মানেই তো বিদেশের কল-কারখানায় গিয়ে শিক্ষানবিশি করে আসা—তাই নয় কি? রমাকে আমি কিছুতেই কারখানায় কামার-কুমারের কাজ করতে দেব না।"

এতদিন পরে কন্যাকে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ দেখিয়া এবং অন্ততঃ একটি বিষয়েও তাহার ঔৎসুক্যের পরিচয় পাইয়া স্যার মৃগাঙ্ক সান্যাল নিরতিশয় খুশী নিশ্চিন্ত হইলেন।

মনীষার কথা শুনিয়া তিনি হাসিয়া কহিলেন—"মেয়েদের কর্ম ও সাধনার ক্ষেত্রে যে পুরুষদের চেয়ে আলাদা আমিও তা বিশ্বাস করি মামনি। যারা স্ত্রী-স্বাধীনতার নাম করে সংসারের স্নিগ্ধ-শান্তিময় পরিবেশ থেকে গৃহলক্ষ্মীদের ছিনিয়ে এনে পুরুষদের একঘেয়ে শ্রমসাধ্য কর্মে নিযুক্ত করতে চায়, আমি তাদের দলে নাই। স্যার মৃগাঙ্ক সান্যাল এই সুযোগে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করিতে চাহিলেন, তিনি হঠাৎ করিয়া বলিলেন, "তাহোলে শিল্প-প্রতিষ্ঠানে অরুণের নিয়োগ কি তোমার মনঃপূত হয়নি মা?"

বস্তুতঃ অরুণের মতবাদ ও চিন্তাধারা লইয়া সম্প্রতি যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে এই পথেও যে তাহার একটা সহজ প্রতিকার হইতে পারিত মনীষা তাহা ভাবিয়া দেখে নাই। সহসা এই অপ্রীতিকর-প্রসঙ্গ আসিয়া পড়াতে মনীষার মুখের

হাসি মিলাইবার উপক্রম হইল। স্যার মৃগাঙ্ক সান্যাল নিজেও অপ্রস্তুত হইলেন না। মনীষা ব্যথিত হইয়া মৃদুস্বরে কহিল—"আমার পছন্দ-অপছন্দেরতো কিছু নেই। অরুণদার সম্বন্ধে তোমার বিচার ও অভিরুচিটাই বড় কথা বাবা। কিন্তু রমা আমার বন্ধু, তার ভবিষ্যৎ-নির্ব্বাচনে আমার যেটুকু অধিকার আছে আমি তাকে ছাড়তে রাজী নই।"

মনীষার কণ্ঠস্বরে অরুণের প্রসঙ্গে যে নির্লিপ্ততা ও ঔদাসীন্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে বিচলিত হইয়া মৃগাঙ্ক সান্যাল দ্রুত প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিলেন। পরিস্থিতিটাকে হালকা করিবার জন্যই যেন তিনি কহিলেন, "রমাকে খবর পাঠাবে তো মামনি?"

"হ্যাঁ বাবা, আমি নিজেই গিয়ে ওকে সংগে করে নিয়ে আসব।" মনীষা পুনরায় উৎসাহিত হইয়া উঠিল। কলেজের মাঠে সেদিনকার আচরণে সে ভুল-বুঝা-বুঝির কারণ থাকিয়া গেলে এই সুযোগে তাহার একটা সন্তোষজনক মীমাংসা করিয়া লইবার জন্যই যে মনীষা রমার সহিত দেখা করিবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে স্যার মৃগাঙ্ক সান্যালের তাহা বুঝিবার কথা নহে।

বি টি রোডের উপর সুরমার পর্ণকুটীরের পার্শ্বে মৃগাঙ্ক সান্যালের অতিকায় গাড়ীটা আসিয়া হর্ণ বাজাইতেই পার্শ্ববর্ত্তী শ্রমিক-ব্যারাকের গুটিকয়েক উলঙ্গ ছেলেমেয়ে কলরব করিয়া আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল। শুক্লা একাদশীর চাঁদ তখন মাথার উপরে কালো মেঘের ফাঁক দিয়া উঁকি মারিতেছে। সংস্কারের

অভাবে জরাজীর্ণ সুরমার ঘরখানি তাহার অতিশয় জীর্ণ অবস্থার জন্যই মনে পড়ে। তাহা ছাড়া মনীষা পূর্বেও একবার রমার সহিত এই গৃহে পদার্পণ করিয়াছিল। মনীষা আসিয়া সুরমার পর্ণকুটীরের দ্বারে দাড়াইতেই রমা ছুটিয়া আসিয়া সাগ্রহে তাহার হাত দুইখানি ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। মনীষাকে বুকের মধ্যে সস্নেহে চাপিয়া ধরিয়া মনোরমা মিষ্টি-অনুযোগ করিল, "মায়ের যে মেয়ের উপর অভিমান করতে নেই বাছা, তা নয় তো মেয়ে যদি মাকে এমন করে ভুলে থাকে, কোন্ মায়ের না কষ্ট হয় বলতো। তবু মেয়ে আমার এখনও স্বামীর ঘর করতে যায় নি।"

মনোরমার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া মুচকি হাসিয়া কহিল, "আজই কি তোমার মেয়ে আসতো না কি? রাজকন্যা নেহাৎ রাজপুত্রের খোজে বেরিয়েছে তাই।"

রমা নিজের রসিকতায় নিজেই সশব্দে হাসিয়া উঠিল। মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া মনীষা একান্ত তৃপ্তির সহিত মাতৃ-স্নেহের উত্তাপ উপভোগ করিতেছিল। তদুপরি মায়ের অনুযোগটাই তাহার মনের মধ্যে প্রবল আলোড়ন তুলিয়াছিল। রমার পরিহাসের যে কোন বিশেষ তাৎপর্য্য থাকিতে পারে ইহা তাহার সহসা হৃদয়ঙ্গম হইল না।

মনীষার হাত ধরিয়া রমা তাহাকে বারান্দা হইতে ঘরে লইয়া আসিল। পথিমধ্যে হঠাৎ সর্প দেখিলে মানুষ যেমন হঠাৎ আঁতকাইয়া উঠিয়া পিছাইয়া যায়, মনীষাও তেমনি ঘরের মধ্যে একটা পা ফেলিতে না ফেলিতেই সভয়ে পিছাইয়া

আসিল। ঘরের এক কোণে বেতের মোড়ার উপর বসিয়া অরুণ নত হইয়া পিলসুজের উপর রক্ষিত মাটির প্রদীপের পলিতাটা একটা দেশলাইয়ের কাঠির সহযোগে বাড়াইয়া দিতেছিল।

মনীষাকে এইভাবে পিছনে হটিতে দেখিয়া রমা চমকাইয়া উঠিল। মনীষার মুখের পানে তাকাইয়া তাহার বিস্ময়ে অবধি রহিল না। অমল হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি মুহূর্তের মধ্যে কেমন ফ্যাকাশে বিবর্ণ হইয়া গেছে। মুখের সমস্ত রক্তটুকু যেন কিসে নিঃশেষে শুষিয়া লইয়াছে। মনীষার নিস্তেজ অসাড়-দেহের পানে তাকাইয়া রমা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। নিরতিশয় ভীত হইয়া সে সভয়ে প্রশ্ন করিল,—"হঠাৎ কি হল তোর? শরীরটা কি তোর আজকাল ভাল নেই মনীষা? ভিতরে গিয়ে বিশ্রাম করে একটু সুস্থ হবি চল।"

মনীষার মনে হইল পৃথিবীটা যেন ক্রমেই তাহার পায়ের তলা হইতে সরিয়া যাইতেছে—সংগে সংগে তাহার মাথাটা এমন প্রচণ্ড বেগে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে যে এখানে আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিলে সেও মাটিতে লুটাইয়া পড়িবে। রমার উপর ভর করিয়া মনীষা অতিকষ্টে টাল সামলাইয়া বাহিরে আসিল।

"আজ আসি রমা, শীররটা বড্ডই খারাপ বোধ হচ্ছে। মাকে বলিস আর একদিন আসব।" বলিতে বলিতে রমাকে কোন কথা বলিবার সুযোগ না দিয়া মনীষা টলিতে টলিতে গাড়ীতে আসিয়া বসিল এবং সংগে সংগে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সমস্ত ব্যাপারটা এমন চকিতে সংঘটিত হইয়া গেল রমা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভয়ে ও বিস্ময়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মনোরমা সমস্ত শুনিয়া বিষম চিন্তান্বিত হইয়া উঠিলেন। সেই রাত্রেই মনীষার খোঁজ লইয়া সংবাদ পাঠাইবার নিমিত্ত তিনি ব্যাকুল হইয়া অরুণকে পুনঃপুনঃ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অরুণের ব্যবহারে কিন্তু কোনই অস্থিরতা প্রকাশ পাইল না। কেবল দুরন্ত অভিমান তাহার মুখের ভাব কঠিন হইতে কঠিনতর হইতে লাগিল। অরুণের উপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবার মতো ধৈর্য্যও কি মনীষার নাই! অরুণ যে কর্ত্তব্যানুরোধে বাধ্য হইয়াই মনোরমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল, ইহা জানিবার কৌতূহল যেমন মনীষার নাই তেমনি তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেও সে বিশ্বাস করিবে কিনা সন্দেহ।

আর মনীষা গাড়িতে আসিয়া বসিলে তাহার দুই চোখ দিয়া শ্রাবণের ধারা নামিয়া আসিল। গাড়ির পিছনের সীটে উবুর হইয়া অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিল। একটিমাত্র চিন্তা তাহার কেবলই তাহার অন্তস্থল পর্য্যন্ত তোলপাড় করিতে লাগিল—সেদিন কলেজ প্রাঙ্গণে অভিনন্দন সভায় কলেজ-কর্তৃপক্ষের আচরণে অরুণের উষ্মাপ্রকাশের কারণ তাহা হইলে কেবল আদর্শগত নয়, ইহার সহিত ব্যক্তিগত প্রশ্নও জড়িত আছে। অরুণ এই কথাটাই তাহার নিকট গোপন করিয়া গিয়াছে। রমাকে তাহার যদি ভালো লাগিয়াই থাকে, সে কথা অরুণ খুলিয়া বলিলেই তো পারে। বন্ধুর জন্য যে কোন

স্বার্থত্যাগ করিতে মনীষা কখনই কুণ্ঠিত হইবে না; আর যে তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে তাহাকে ভালো বাসিবার মতো বিড়ম্বনা সংসারে অল্পই আছে। এইরূপ নানাবিধ যুক্তির অবতারণা করিয়া মনীষা নিজেকে বৃথাই সান্ত্বনা দিতে চাহিল। অবোধ মন কিন্তু ঈর্ষানলে কেবলই দগ্ধ হইতে লাগিল।

॥ পনেরো ॥

কথায় বলে মানুষ খুন করিবার পক্ষে একটা ক্ষুদ্র আলপিনই যথেষ্ট। অতিমাত্র দাহ্য পদার্থে অগুণ ধরাইবার পক্ষে একটা স্ফুলিঙ্গের কার্য্যকারিতা অসীম। স্যার মৃগাঙ্ক সান্যালের লৌহ ও ইস্পাত কারখানাটা জবরদস্ত ওয়েলফেয়ার অফিসার উপানন্দ হাজরার অসহ্য অত্যাচার-উৎপীড়নে ক্রমে একটা বারুদের স্তূপে পরিণত হইয়াছিল। আয়রন-ফাউণ্ড্রির চার্জম্যান ইয়াসিন সরদারকে অন্যায়ভাবে বদলির আদেশ যে শেষে অগ্নিকণা হইয়া এই বারুদের স্তূপে আগুণ ধরাইয়া দিতে পারে ক্ষমতাগর্হিত উপানন্দ হাজরা বোধ করি কল্পনাও করিতে পারে নাই। কিন্তু ব্যাপার দাঁড়াইল তাহাই। প্রথমদিন আয়রণ-ফাউণ্ড্রির শ্রমিকেরা মিঃ হাজরার অন্যায় আদেশের প্রতিবাদে কয়েকটি কর্মবিরতি ঘোষণা করিল, দেখিতে দেখিতে অন্যান্য কয়েকটি বিভাগেও ছড়াইয়া পড়িল এবং দুই এক দিনের মধ্যেই সমগ্র কারখানার প্রায় পাঁচ হাজার শ্রমিক ধর্মঘটে যোগদান করাতে, কারখানার কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।

ইয়াসিন সরদারের বিরুদ্ধে ওয়েলফেয়ার অফিসার মিঃ হাজরার আক্রোশের কারণ ও বদলির আদেশের পিছনে যে দুরভিসন্ধি রহিয়াছে, তাহা লইয়া শ্রমিকদের মধ্যে জোর প্রচার-কার্য্য চলিতেছে। কারখানার অভ্যন্তরে ও বাহিরে সভা করিয়া আদেশ প্রত্যাহার ও এমন কি ওয়েলফেয়ার অফিসারের পদত্যাগ দাবী করিয়া জ্বালাময়ী বক্তৃতা প্রদত্ত হইতেছে। অবস্থা আয়ত্তে আনিবার জন্য মিঃ হাজরার শাসন-তোষণে কোনই ফল হইল না। বরং শ্রমিকদের বিক্ষোভ ও হিংসাত্মক কার্য্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশের উদ্যোগ করিতে লাগিল। শেষে পরিস্থিতি সম্পুর্ণ আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গেলে মিঃ হাজরা বাধ্য হইয়াই স্যার মৃগাঙ্ক সান্যালের শরনাপন্ন হইলেন।

গত কয়েক দিনের উদ্বেগজনক সংবাদে শিল্পপতি অতিশয় বিচলিত হইয়াছিলেন। তাঁহার যতগুলি শিল্প-সংস্থা আছে কোথাও শ্রমিকদের মধ্যে বিন্দুমাত্রও অসন্তোষ নাই সরকারী মহলে ইহাই তিনি সগর্বে প্রচার করিতেন। বস্তুতঃ তাহার এই বিপুলসংখ্যক শ্রমিক কর্মচারী যে অদ্যাবধি কোনরূপ ধর্মঘট বা প্রকাশ্য বিক্ষোভ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হয় নাই, দেশের শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে স্যার মৃগাঙ্ক স্যান্যালের অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠা ও অপ্রতিদন্দ্বী নায়কত্বের অন্যতম কারণও ছিল ইহাই। পুঁজি-বাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন নিমিত্ত ও মুনাফালোভী শিল্পনায়কের এই দম্ভের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করিবার জন্য বামপন্থী-সংবাদপত্রগুলি ধর্মঘটের সংবাদ বড় শিরোনামায় ফলাও করিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শিল্পনায়কের শিল্পপ্রতিষ্ঠান-

গুলিতে শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে যুগপৎ নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করিয়া তাহারা একের পর এক বিস্ময় বৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে।

কোম্পানির ওয়েলফেয়ার অফিসার মিঃ উপানন্দ হাজরা বহুবৎসরের অভিজ্ঞ ও বিশ্বাসী কর্মচারী। তাহার যোগ্যতা সম্বন্ধেও মালিকের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। তথাপি প্রকৃত সংবাদ অবগত হইবার জন্যই শিল্পপতি জানিতে চাহিলেন —যাহাকে লইয়া এই ধর্মঘটের সূত্রপাত সেই ইয়াসিন সরদারের কত বৎসরের চাকুরী, মজুরির হার, বদলির প্রয়োজন ইত্যাদি।

মিঃ উপানন্দ হাজরা প্রকৃত তথ্য গোপন করিয়া কহিলেন, "ইয়াসিন কোম্পানির বিরুদ্ধে শ্রমিকদের খেপিয়ে তুলছিল। খাদ্যরেশন পুনঃপ্রবর্ত্তনের দাবী তুলে সে ক্রমাগত আয়রণ-ফাউণ্ড্রির শ্রমিকদের ধর্মঘটে প্ররোচিত করছিল। কাজেই কোম্পানির স্বার্থে তাকে অবিলম্বে এস্থান থেকে সরিয়ে দেওয়া অবশ্য প্রয়োজন মনে করেই আমি তাকে ট্রান্সফারের অর্ডার দিয়েছিলাম।"

শিল্পপতি স্যার মৃগাঙ্ক সান্যাল এই অকাট্য-যুক্তি শুনিয়া আপাততঃ আশ্বস্ত হইলেন। কোম্পানির স্বার্থরক্ষার পক্ষে যাহা অপরিহার্য্য, মিঃ হাজরা বিনাদ্বিধায় তাহা সম্পাদন করিয়া কর্ত্তব্য ও দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়াছে। শ্রমিকের অসঙ্গত দাবী ও বে-আইনী কার্য্যকলাপ শিল্পপতি আদৌ বরদাস্ত করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি দৃঢ়তার সহিত সুস্পষ্ট নির্দেশ

দিলেন,—“আমার নাম করে আপনি সকল শ্রমিক-কর্মচারীদের আদেশ দিয়ে দিন, কালকের মধ্যে যারা কাজে যোগদান না করবে তাদের বরখাস্ত করা হবে। শ্রমিকদের খেয়াল-খুশির নিকট কোম্পানি কিছুতেই মাথা নত করবেনা।”

স্যার মৃগাঙ্ক সান্যালের সমর্থন পাইয়া মিঃ হাজরা নিশ্চিন্ত হইলেন। শিল্পপতির মনোভাব অধিকতর অনকূল করিবার জন্য তিনি পুনরায় কহিলেন, “কোম্পানির স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত যা উচিত ও করণীয় বলে মনে করেছি, কোনরূপ ভীতি-প্রদর্শনে বিচলিত না হয়ে আমি তাই করেছি। আপনি তো জানেন কোম্পানির সহিত আমার এই দীর্ঘকালের যোগ কোম্পানির স্বার্থবিরোধী-কার্য্যের দ্বারা কি কর্ত্তব্যকার্য্যে স্বেচ্ছাকৃত ত্রুটির দ্বারা কোনদিন এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। এতদিন কঠোরহস্তে শৃঙ্খলা রক্ষা করেছি বলেই আজও দেশের আইন-সভাগুলিতে সরকারের মুখপাত্রগণ শিল্পে শান্তি রক্ষার জন্য স্যার মৃগাঙ্ক সান্যালের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। I have placed all my Cards before you, আমার action যদি আপনার কাছে অসঙ্গত মনে হয় আমাকে যদি অযোগ্য বলে মনে করেন আপনি এই মুহূর্ত্তে আমাকে বিদায় দিন। আমি শুধু এই সান্ত্বনা নিয়ে যেতে চাই যে মালিকের স্বার্থহানি কাজ আমি করিনি।”

“My confidence in you I must confess has not been shaken by any of your actions so far. You have got my fullest support in what you

have done, Mr. Hazra. I shall ask the Home-department to round up the bad characters".

যারা ধর্মঘটে প্ররোচনা দিয়ে শান্তিভঙ্গ করছে, বিশ্বাসী ও অনুগত শ্রমিক-কর্মচারীদের ভীতিপ্রদর্শন করে ধর্মঘটে যোগদান করতে বাধ্য করছে, আপনি কালকের মধ্যে তাদের নামের একটা লিষ্ট আমাকে দেবেন।

স্যার মৃগাঙ্ক সান্ন্যাল উত্তেজনায় চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও ইতস্ততঃ পায়চারী করিতে করিতে বলিলেন, স্ট্রাইকাররা কালকের মধ্যে কাজে যোগদান না করলে আমি কারখানা লক-আউট করে দেব। জোর করে ধর্মঘট করে, ভয় দেখিয়ে যে স্যার মৃগাঙ্ক সান্ন্যালের কাছ থেকে যে প্রতিকার পাওয়া যাবে এটা আমি তাদের শিখিয়ে দিতে চাই। এক-আধটা কারখানা কয়েক মাস বন্ধ রাখলে আমার কিছু আসে যায় না, কিন্তু শ্রমিকেরা কতদিন কাজ না করে থাকতে পারবে আমি সেইটেই দেখে নিতে চাই।

চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া স্যার মৃগাঙ্ক সান্ন্যাল উপানন্দ হাজরার পাশের চেয়ারটা টানিয়া আনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন "যারা দুবেলা খেতে পায় না আমি জানি, তারা এত দুঃসাহস পেল কোথায় ?"

গোলোযোগ সৃষ্টি করিয়া বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্য হইতে যাহারা স্বার্থসিদ্ধ করিয়া লয় মিঃ হাজরা সেই শ্রেণীর লোক। ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে দেখিয়া তিনি ধীরে ধীরে সবিনয়ে আসল কথাটি পাড়িলেন, "কথাটা হয়তো আপনাকে না বলাই

উচিত, কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থের অবস্থা ও শ্রমিকের জীবন সম্বন্ধে অরুণবাবুর বিভিন্ন সংস্কার-প্রচেষ্টার এরা সুযোগ নিচ্ছে। তার মত উদার ও শিক্ষিত যুবকের এই বয়সে catchy শ্লোগান ও তথাকথিত প্রগতিপন্থী-ভাবধারায় আকৃষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সুযোগসন্ধানী স্বার্থান্বেষী-লোকেরা এই ভাবপ্রবণতার সুযোগ নিয়ে থাকে। সেইজন্যই অরুণ-বাবুকে বলেছিলাম শ্রমিকের সংগে মালিকের প্রত্যক্ষ যোগ না রাখাই উচিত—শ্রমিকদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা ভালো, কিন্তু তাদের সংগে নির্বিচার-ঘনিষ্ঠতা ভালো নয়। এসব অবশ্য ঠেকেই শিখতে হয়। এই ধর্ম্মঘট থেকে তিনি নিশ্চয়ই তার ভুল বুঝতে পারবেন। কিন্তু আমার মনে হয় এই ধর্ম্মঘটের দায়িত্ব যে কতকটা তার, এবিষয়ে তিনি যত শীঘ্র সচেতন হন ততই মঙ্গল। এর পরে তিনি যদি শ্রমিকদের ব্যক্তিগত জীবনে I mean, এ্যড্মিনিস্ট্রেটিভ এ্যাফেয়ার্স'এ আর সংশ্রব না রাখেন, তবেই কারখানার শান্তি প্রতিষ্ঠা সহজ হবে।”

স্যার মৃগাঙ্ক সান্যাল চুপ করিয়া অভিনিবেশ সহকারে মিঃ হাজরার বক্তব্য অনুধাবন করিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহার মুখের উপর গভীর উদ্বেগের ছায়াপাত হইল। তিনি অনুচ্চকণ্ঠে অনেকটা স্বগতভাবেই বলিলেন, “দেশের শ্রম-নীতি ও শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক নিয়ে অরুণের নিজস্ব মত পোষণ করবার স্বাধীনতা থাকতে পারে, কিন্তু তার মত ও বিশ্বাসের দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে। বিশেষ তার সংস্কার-প্রচে-

যদি শ্রমিকদের উচ্ছৃঙ্খল করে তোলে, শ্রমিকগণকে কোম্পানির স্বার্থহানিকর কার্য্যে প্রবৃত্ত করে, তবে তার দায়িত্ব নিঃসন্দেহে তাকেই বহন করতে হবে।"

স্যার মৃগাঙ্ক সান্যাল স্বগতভাবে যাহা বলিলেন তাহা আশাতীত উৎসাহব্যঞ্জক না হইলেও মিঃ হাজরা এই ভাবিয়া নিরস্ত হইলেন যে তিনি যে dose দিয়াছেন তাহার ক্রিয়াই অনেকক্ষণ চলিবে। এই ঔষধেই যদি সুফল পাওয়া যায় তবে আর অরুণের ব্যক্তিগত চালচলন ও গতিবিধি সম্বন্ধে অভিযোগ আপাততঃ স্থগিত রাখাই সমিচীন। মিঃ হাজরার হাতে ঐটাই হইতেছে ব্রহ্মাস্ত্র—সর্বশেষ-ব্যবস্থা হিসাবে তিনি সেইটে প্রয়োগ করিবেন ভাবিয়া এখনকার মত তূণে তুলিয়া রাখিলেন।

॥ ষোল ॥

মনোরমা যদি আসিয়া তাহার পরলোকগতা বোন্‌ঝি সুরমার সংসার-তরণীর হাল ধরিয়া না বসিত, মাতৃহীন অপোগণ্ড শিশুগুলি যে পিতার অযত্ন-অবহেলার দমকা হাওয়ায় ডুবিয়া মরিত তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথমে সুরমা হাসপাতালে ভর্তি হইলে ছেলেমেয়েগুলিকে দেখাশুনার লোকের অভাবের কথা ভাবিয়া ও এই বয়সে বিদেশ-বিভুঁইয়ে যাহাতে একেবারে অনাত্মীয়ের মধ্যে আশ্রয় লইতে না হয় এইজন্য মনোরমা সুরমার বাসাতে আসিয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর এক এক করিয়া ছয়টি মাস গত হইয়াছে। মা-মরা শিশুগুলির উপর এখন এমনই মায়া পড়িয়া গেছে যে অন্যত্র যাইবার কথা মনে হইলেই মনোরমার দুই চক্ষু ছল ছল করিয়া ওঠে। গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে শুষ্ক-মৃত্তিকা ও লতা-গুল্ম যেমন বর্ষার বারি-সিঞ্চনে সরস ও সজীব হইয়া উঠে, সুরমার ছেলেমেয়েগুলি তেমনি মনোরমার আদর-যত্ন পাইয়া অল্পদিনের মধ্যেই সতেজ ও প্রাণ-চঞ্চল হইয়া উঠিল। একটু স্নেহ-মমতার অভাবে এই কচি-প্রাণগুলি বিরস ও বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছিল—দিদিমার আদর-সোহাগে নাতি-নাতনীদের প্রাণে এখন স্ফূর্তি ও চঞ্চলতা জাগিয়াছে।

সুরমা বাঁচিয়া থাকিতেই সুরপতি সংসারের দিকে বড়-একটা ফিরিয়া তাকায় নাই। যেদিন হইতে মনোরমা এই সংসার ঘাড়ে

লইয়াছে সেইদিনই সুরপতি সমস্ত দায়িত্ব নিজের উপর হইতে সম্পূর্ণ ঝাড়িয়া ফেলিয়াছে। ভোরবেলা দুটি নাকে-মুখে গুজিয়া সেই যে বাহির হইয়া যায়, মধ্যরাত্রিতে মদের নেশায় চুর হইয়া শ্লথপদে টলিতে টলিতে বাড়ি ফিরিয়া আসে—তাহা ছাড়া সংসারের সহিত তার আর কোন সম্পর্ক নাই। প্রথম প্রথম সুরপতির লজ্জাস্কর গতিবিধি ও চালচালন মৃদু প্রতিবাদ করিয়া মনোরমা অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছে, সংসারের আর্থিক প্রয়োজনের প্রতি বারংবার সুরপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অপমানিত হইয়াছে। কিন্তু রমার পরীক্ষার ফল বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত সমস্তই মুখ বুজিয়া সহ্য করা ভিন্ন উপায় ছিল না। নিজের ভুলের জন্য মনোরমার মন আত্মগ্লানিতে ভরিয়া গেছে।

মনোরমাকে পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়া মৃত্যুঞ্জয় যে কয়দিন ছিল তাহার মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের পীড়াপীড়িতেই সুরপতি হাসপাতালে সুরমাকে দেখিতে গিয়াছিল। তাহার পূর্বে কি পরে সুরপতি আর সেমুখো হয় নাই। এ সব দেখিয়া-শুনিয়া মনোরমা নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলিত। মৃত্যুঞ্জয় চলিয়া যাইতে না যাইতেই সুরপতির আসল-স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। নাতি-নাতনীদের প্রতি মনোরমার স্নেহের টান যে কিছু নয়, শুধু ছলনা মাত্র—ছেলেমেয়েদের দেখাশুনার লোকের অভাবের অজুহাত তুলিয়া মনোরমা যে সুরপতির কষ্টোপার্জ্জিত-অন্ন ধ্বংস করিবার জন্যই আসিয়াছে। নিজের মেয়ে রমার কাছাকাছি থাকা ও সম্ভব হইলে তাহাকেও আনিয়া এই বাড়িতে উঠানোই যে মনোরমার আসল মতলব সুরপতি তাহা উঠিতে বসিতে

মনোরমাকে শুনাইয়া বলিত। লজ্জায় ও দুঃখে মনোরমা মাটির সহিত মিশিয়া যাইত—সে সহস্রবার নিজেকে ধিক্কার দিত।

পরীক্ষার ফল যেদিন বাহির হইয়াছে সেইদিন রমা মনোরমাকে বলিয়াছে, "এ বাসা ছেড়ে এবার চলো মা। বৃত্তির টাকাতেই আমার পড়ার খরচ চালিয়ে আমরা দুটিতে বাসা ভাড়া করে থাকতে পারবো। আর এক মুহূর্ত আমি এখানে তিষ্ঠিতে পারছি নে।"

মনোরমা হয়তো রওনা হইবার জন্য গোছ-গাছ করিতে আরম্ভ করিয়াছে কিন্তু সুরমার কোলের ছেলেটি যেই আসিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছে, "আমাকে ফেলে যাবে না তো মাসী? তুমি গেলে, বাবা আমাকে মারবে।" অমনি চোখের জলে তাঁহার সঙ্কল্পের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেছে।

আজ কিছুদিন হয় সুরপতির ব্যবহারে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া মনোরমা বিস্মিত হইয়াছে, রমা শঙ্কিত হইয়াছে। এই গৃহে আসিয়া অবধি সুরপতির খিটখিটে মেজাজ ও নির্মম-নির্লজ্জ উদাসীনতার সহিতই তাহাদের পরিচয় হইয়াছে। তাই সুরপতির মুখে সহসা আদর-আপ্যায়ন ও যত্ন-আত্তির কথা শুনিয়া রমা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। সুরমা বাঁচিয়া থাকিতেই তাহার কাছে রমা সুরপতির ভ্রষ্ট-চরিত্রের কথা শুনিয়াছিল। এখানে আসিয়া মদ্যপায়ি সুরপতির মাতলামো সে নিজের চক্ষেই দেখিয়াছে। এই কারণে রমা সুরপতিকে সর্বদাই এড়াইয়া চলিত। সুরপতির কথাবার্ত্তা ও ব্যবহারে রমার সম্বন্ধে আগ্রহ

ও আন্তরিকতার পরিচয় পাইয়া মনোরমার মন সংশয় ও কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে।

যে রাত্রিতে সুরপতিকে মাতাল হইয়া ফিরিতে দেখিয়াছে, তাহার পরদিন ভোরবেলা মনোরমা দাওয়ায় বসিয়া তরকারি কুটিতে ব্যস্ত ছিল। বারান্দার অপরপ্রান্তে রমা উনুনের পার্শ্বে বসিয়া ভাতের মার গালিতেছিল। সদ্যঃ ঘুম হইতে উঠিয়া সুরপতি নিজেই একখানি পিঁড়ি টানিয়া উভয়ের মাঝখানে আসিয়া বসিল। কর্কশ-ভাঙ্গা-গলা একটু মোলায়েম করিয়া কহিল, "মেয়ে বেঁচে না থাকলেও নাতি-নাতনীদের জন্যে দিদিমাকে করতেই হবে কিন্তু রমা দুদিনের জন্য বেড়াতে এসেছে, ও-কেন এত খাটছে মাসী? ওকে তো আমি দু'দণ্ড সুস্থির হয়ে বসতে দেখি না। সত্যি, এখনকার লেখাপড়া-জানা মেয়েদের মধ্যে এমন লক্ষ্মী মেয়ে আর একটি মেলে না। নামেও যেমন লক্ষ্মী, তোমার মেয়ে কাজেও হয়েছে তেমনি।"

রমার দিকে একবার আড়চোখে তাকাইয়া দেখিয়া সুরপতি আবার কহিল, "বলি অমন মাখনের মত রং কয়লার ধোঁয়ায় যে একেবারে কালীবর্ণ হয়ে গেছে। সোমত্ত-মেয়ে একটু সেজেগুজে থাকলে তো পাঁচজনের নজরে পড়বে। তুমিও যেমন সেকেলে, তোমার মেয়েও হয়েছে তেমনি সেকেলে। সুরমা বেঁচে থাকলে রমাকে নিয়ে কত আমোদ-ফূর্তি করতো। তুমি বলবে মেয়ে নেই, তাতে কি হয়েছে, জামাই তো আর পর নয়। কিন্তু আমার ফুরসত কোথায়!"

রমার সমস্ত শরীর ঘৃণায় রিরি করিয়া উঠিল। এই দুশ্চরিত্র

বিকৃতরুচি মাতালটার লোলুপ-দৃষ্টি—সে আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিল না। তাড়াতাড়ি কোনরকমে ভাতের ফেনটা গালিয়াই স্থান ত্যাগ করিল। সুরপতির আত্মীয়তা যে বিষধর-সর্পের আলিঙ্গনের মতই সাংঘাতিক ও প্রাণান্তকর, মনোরমা তাহা ভালভাবেই জানিত। সুরপতিকে নিরুৎসাহ করিবার সহজ উপায়-হিসাবে সে নীরবে কুটনো কুটিতে লাগিল—একটি কথারও জবাবও দিল না।

সুরপতি কিন্তু দমিল না। সে অধিকতর উৎসাহভরে কহিল, "হ্যাগা মাসী, কাল যে ছোট সাহেবকে দেখলাম—ও চিনতে পারলে না বুঝি, তোমাদের অরুণ চৌধুরী গো—ব্যাপার কি মাসী! বলি, কিছু আশা-ভরসা পেলে?"

মনোরমা যেন আকাশ হইতে পড়িল। এই প্রশ্নের মধ্যে যে একটা বিশ্রী ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহা উপলব্ধি করিয়াই সে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "এসব তুমি কি বলছ সুরপতি? তোমার কি মাথা খারাপ হলো না কি!"

সুরপতি একমুখ হাসিয়া কহিল, "আমার মাথা খারাপ হবে কেন? বলছিলাম আমাদের রমা তো আর দেখতে-শুনতে কারও চেয়ে ফেলনা নয়, আর তুমিও ওকে আইবুড়ো করে রাখতে চাও না। ছোট সাহেবের যদি পছন্দ হয়ে থাকে, আমাদেরই পোয়া-বার বলতে হবে। এর মধ্যে লুকোচুরির কি আছে মাসী। ভয় নেই, ভাংচী দেব না। রমার বিয়ে সম্বন্ধে তো আমারও দায়িত্ব আছে।"

সুরপতি উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিয়া স্নানের উদ্যোগ করিতে

উঠিয়া গেল। মনোরমা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া বসিয়া রহিল—মুখ দিয়া একটি কথাও সরিল না।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে সন্ধ্যারাত্রিতে একদিন, অন্যদিনের মতো অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত বাহিরে না কাটাইয়া, কারখানার ছুটির পরেই সুরপতি বাসায় ফিরিয়া আসিল। রমা কি মনোরমা কেহই এ ব্যতিক্রমের জন্য প্রস্তুত ছিল না।

বগল হইতে সুদৃশ্য কাগজের মোড়কটি লইয়া সুরপতি রমার দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া হাসিয়া কহিল, "কতদিন ধরে ভাবছি কুটুমের জন্য একখানি পোষাকী শাড়ী কিনবো, হয়েই উঠছে না। আজ কতগুলো ফালতো-টাকা পেয়ে গেলুম কিনা তাই।"

রমাকে সশঙ্কিতভাবে উঠিয়া যাইতে দেখিয়া সুরপতির উৎসাহ নিভিয়া গেল। কিন্তু সে একেবারে নিরস্ত হইল না। সহাস্যে মনোরমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে চাহিল এই দামী শাড়ীখানা রমাকে কারখানার ওয়েলফেয়ার অফিসার মিঃ উপানন্দ হাজরা উপঢৌকন দিয়াছে—মিঃ হাজরার নিষেধ ছিল বলিয়াই সুরপতি জিভের ডগায় কথাটা আসিয়া মিলাইয়া গেল।

নৈশ-ভোজনের সময় সুরপতি মনোরমাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল, "আমাদের রমার পাশের খবর যেদিন বেরিয়েছে সেদিন থেকে আমি সবাইকেই বলছি ওর একটা ব্যবস্থা হয় কি না। তোমার ভবিষ্যতের কথাটাও তো আমাদের ভাবতে হয়—তোমার তো আর ছেলে নাই যে রোজগার করে খাওয়াবে।

রমা যদি অত লেখাপড়া শিখে চাকরিই না করলো, তবে আর লেখাপড়ার কি মর্য্যাদা রইলো বলো।"

একটু থামিয়া সুরপতি পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল, "আজকাল অফিসে অফিসে এত মেয়ে ঢুকছে যে ছেলেদের চাকরি মেলাই ভার হয়েছে। আমাদের ওয়েলফেয়ার-অফিসার হাজরা সাহেব বলেন পশ্চিম দেশের ন্যায় আমাদের এখানেও অফিসে লেখা-পড়ার কাজ করবে মেয়েরা, আর ছেলেরা করবে কল-কারখানার যত মেহনতের কাজ।"

সুরপতির কথায় মনোরমার আস্থা নষ্ট হইয়াছে অনেকদিন পূর্বেই। এখন সুরপতির মুখে ভালো কথা শুনলেও অনিশ্চিত আশঙ্কায় বুক দুরু দুরু করিতে থাকে। রমার প্রসঙ্গ বলিয়া নয়, সুরপতি যে বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ করিয়াছে তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়াও নয়, সুরপতির বক্তব্যের মধ্যে প্রাচীনা মহীলাদের মুখরোচক সামাজিক-সমস্যার উল্লেখ ছিল বলিয়াই স্বভাবতঃই মনোরমা কিঞ্চিৎ আগ্রহ প্রকাশ করিল। "সে তো নিজের চোখেই দেখছি বাবাজী। ভদ্র-ঘরের মেয়েরা মেম সেজে অফিস-কাছারী করবে, আমাদের পাড়াগাঁয়ের লোকেরা তা কল্পনাই করতে পারতো না। এখানে এসে দেখছি দিন নেই রাত নেই মেয়েরা পুরুষদের সংগে সমানে পাল্লা দিয়ে চলেছে—অফিস-আদালতে, হাটে-বাজারে মেয়ে-পুরুষে কোন ভেদ নেই।"

সুরপতি উৎসাহিত হইয়া কহিল, "সেই কথাই তো তোমাকে বলছি মাসী, রমাকে একটা চাকুরীতে ঢোকাবার জন্য কি আমি

কম করেছি! শেষে অনেক বলে-কয়ে কাকুতি-মিনতি করে হাজরা সাহেবকে রাজী করিয়েছি। হাজরা সাহেব দয়াবান-দেবতুল্য মানুষ। তাঁকে ধরে পড়লে তিনি কোন্ কথাটি না রাখেন। আমাদের কারখানায় তেমন কোনো ভালো চাকরিই খালি পড়ে নাই। অনেক করে বলাতে তবেই না হাজরা সাহেব রমাকে আপাততঃ তাঁর নিজের দপ্তরেই একান্ত সচীবের পদে রাখতে রাজী হয়েছেন।"

ঢোক গিলিয়া সুরপতি বলিয়া চলিল, "এই পোষ্টে আগে ছিল একজন মেমসাহেব, বুঝলে মাসী। রমা কম করেও মাসে তিনশোটি করে টাকা পাবে। মিঃ হাজরা বিদ্বান-গুণবান লোক—লেখাপড়ার কদর বোঝেন। তা না হলে প্রথমেই কেউ এত টাকা মাইনে দেয় বল! রমা যে পরিমাণে মাইনে পাবে সে পরিমাণে তাকে কাজ করতে হবে কত কম, শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে মাসী।"

মনোরমার কিছুমাত্র ভাবান্তরে প্রভূত পরিমাণে উৎসাহিত হইয়া সুরপতি বলিতে লাগিল,—"অফিসে সাহেবের চিঠি গোছ-গাছ করে রাখা, সাহেবের সঙ্গে পার্টিতে গিয়ে নেমন্তন্ন রক্ষা করা, অবসর সময়ে গল্পগুজব করা—সাহেবের মর্জি হলে সাহেবের বাসায় গিয়ে ডিনার খাওয়া—ভারী তো কাজ! হ্যা, তবে কিনা সব সময়ে সেজেগুজে ফিটফাট থাকতে হবে, খুব স্মার্ট দেখতে হলে তবে তো সাহেব পছন্দ করবেন। অতএব সাহেবের মন যুগিয়ে চলতে পারলে বরাত খুলে যেতে কতক্ষণ, কি বলো মাসী? কথা কইছো না যে?"

প্রস্তাবটি যে উপেক্ষণীয় নয়, সরলা মনোরমা তাহা বুঝিল কিন্তু সুরপতির আনীত বলিয়াই প্রকাশ্যে তেমন উৎসাহ প্রকাশ করিল না—ধূর্ত্ত সুরপতি আবার কোন চোরাবালির মধ্যে নিয়ে ফেলবে কে জানে !

সে সন্দিগ্ধভাবে কহিল, "তুমি না করলে কে করবে বাবাজী, আমাদের কে আর আপন লোক আছে বলো! এইতো ক'মাস হলো মায়ে-ঝিয়ে এখানে পড়ে আছি। রমার একটা ব্যবস্থা হলে তুমিও নিশ্চিন্ত হতে পারবে। তা বাবাজী তোমার কথাটা আমি ভেবে দেখবো। ভেবে চিন্তে যা হয় তোমাকে জানাবো। রমার মতটাও একবার তো জানা দরকার। সে তো আর ছেলে মানুষ নয় যে জোর করে একটা চাপিয়ে দিলেই হোল, আমি তো আর মেয়েকে তার ইচ্ছে না হলে চাকরি করতে বাধ্য করতে পারি না, বুঝলে না বাবাজী।"

"সে তো নিশ্চয়ই।" সুরপতি বাঁকা হাসি হাসিয়া কহিল, "তা ছাড়া, এর চেয়ে ভালো চান্সও তো থাকতে পারে। হাতের কাছে এসেছে বলে যে খপ করে না ভেবে চিন্তে এটাকেই করতে হবে, তেমন কথা আমিই বা কেন বলব রমা তো আর জলে পড়েনি মাসী।" প্রত্যুত্তরে মনোরমা কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু ততক্ষণে সুরপতি ঘাটের পথে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সুরপতি চলিয়া গেলে মনোরমা ডাকিল, "রমা, ওরমা শুনছিস ?" রমার কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল

রমা তাহার ময়লা শাড়ি কয়খানা স্যুটকেশে বোঝাই করিতেছে।

মাকে দেখিয়া সে কিঞ্চিৎ উত্তেজিতভাবে কহিল, "তোমার জামাই ও আদরের নাতি-নাতনি নিয়ে তুমি থাকো মা। আমাকে আর একমুহূর্ত্ত এ নরককুণ্ডের মধ্যে রাখতে চেও না। মদের নেশাতেও যে আর তোমার বাবাজীর এখন কুলোচ্ছে না মা—সে যে এখন অন্য মতলবে ঘুরছে, বুঝতে পারছো না মা। তোমার থাকতে ইচ্ছে হয় তুমি থাকো, আমি আমার সম্মান নিয়ে যে দিকে দু'চোখ যায় চলে যাই।"

রমা যে ঘর হইতে সুরপতির কথাগুলি আদ্যন্ত শুনিয়াছে, ইহাতে আর সংশয় রহিল না। হঠাৎ জানালার দিকে চোখ পড়িতে মনোরমা দেখিল সুরপতির দেওয়া শাড়ির মোড়কটা যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থাতেই বাহিরে জল-কাদায়, আবর্জ্জনার স্তূপের মধ্যে পড়িয়া আছে। মনোরমা ইহাতে বিস্মিত হয় নাই, বরং এই রকম যে হইবে সে তখনই অনুমান করিয়া লইয়াছিল।

মনোরমা অনেক বুঝাইল, সুরপতি চলিয়া গেলে সে তাহার অযত্ন-অবহেলায় সুরমার নাবালক-ছেলেমেয়েদের যে শোচনীয় অবস্থা হইবে তাহার অনেক কাল্পনিক চিত্র রমার সম্মুখে উপস্থিত করিল। অনেক চোখের জল ফেলিয়া সে যাত্রাও রমাকে নিবৃত্ত করিল সত্য, কিন্তু তাহার পর হইতে রমার ভাবগতিক দেখিয়া মনোরমার প্রাণ শুকাইয়া যাইতে লাগিল। রমা কাহারও সহিত কথা বলে না, নিতান্ত প্রয়োজন না

হইলে মনোরমার সংগেও না। সুরপতির ছায়া মাড়াইলেও পাছে অশুচি হইতে হয় এই ভাবে সমস্ত সংস্রব বাঁচাইয়া চলে।

নিরুপায় মনোরমা উভয় সংকটে পড়িয়াছে। কি যে করিবে সে দিনরাত ভাবিয়াও স্থির করিতে পারে না। এখানে এমন কেহ নাই যে উচিত পরামর্শ দিয়া এই বিপদে একটু সাহায্য করিবে। বেগতিক দেখিয়া মনোরমা সুরমার বড় ছেলেটিকে দিয়া রমার অজ্ঞাতে অরুণকে সংবাদ পাঠাইল। উপস্থিত বিপদে পরামর্শ চাওয়া ছাড়াও, মনোরমা ভাবিয়াছিল, রমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অরুণের পরামর্শ চাহিয়া ইতি-কর্ত্তব্য স্থির করিবে—কারখানায় যথার্থই রমার চাকুরীর কোন সম্ভাবনা থাকিলে অরুণই তাহার সঠিক অনুসন্ধান দিতে পারিবে। যে রাত্রে অরুণ কারখানা হইতে ফিরিবার পথে মনোরমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল, সেরাত্রেই হঠাৎ মনীষা গোপনে উপস্থিত হইয়া একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে মনোরমার গৃহে অরুণকে আবিস্কার করিয়া অভিমানে ক্ষুব্ধ ও আহত হইয়া তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতেই নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল।

॥ সতেরো ॥

হাওড়া ষ্টেশনে নামিয়া ব্যারিষ্টার পীতাম্বর চৌধুরী সোজা স্যার মৃগাঙ্ক সান্যালের গৃহে উপনীত হইলেন। প্রধান-তোরণে গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া উপরে উঠিতে যাইবেন লিফ্‌টের মুখে মনীষাকে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। একখানি বইয়ের খোঁজে মনীষা লাইব্রেরী কক্ষে নামিয়া আসিয়াছিল। তাঁহার সর্বাঙ্গ শ্বেত-বসনে আবৃত, নিতম্ব-বিস্তৃত ঘণকৃষ্ণ আলুলায়িত কেশরাশি রুক্ষ ও অবিন্যস্ত, চোখের দৃষ্টি উদাসীন। হাতে স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগের রাজসংস্করণ। পীতাম্বর চৌধুরী মনীষাকে নিজের মেয়ের তুল্য স্নেহ করিতেন। এই অনভ্যস্ত বেশভূষায় মনীষাকে দেখিয়া তিনি ব্যথিত হইলেন। তিনি নীরবে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া আসিলেন—মনীষাও নিঃশব্দে তাহাকে অনুসরণ করিল। দ্বিতলে উঠিয়া মৃগাঙ্ক সান্যালের কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া তিনি মনীষাকেই প্রশ্ন করিলেন—"তোমার বাবা কি কোথাও বেরিয়েছেন? ভোর-বেলাটা তো তিনি বরাবর বাড়িতেই কাটাতেন।"

মনীষা নির্লীপ্তভাবে উত্তর করিল, "আজ ক'দিন ধরেই দেখছি দিনরাত কেবল ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছেন। নাওয়া-খাওয়ার কোন সময়-অসময় নেই। আপনি বুঝি কোলকাতায় ছিলেন না?"

"না মা আমি তো দিল্লী থেকে এইমাত্র ফিরছি। সুপ্রিম-কোর্টে একটা মামলার সওয়াল করতে গত একটা মাস আমি

নূতন দিল্লীতেই ছিলাম। কালকে হঠাৎ তোমার বাবার জরুরী একটা তার পেয়ে তখনই গাড়িতে চেপেছি, নেমে সোজা এখানেই আসছি। ভেবেছিলাম মৃগাঙ্কদার সংগে দেখা করে তারপর বাড়ী ফিরবো ?”

“আপনি তাহলে আর একটুকাল অপেক্ষা করে যান কাকাবাবু। বাবা হয়ত এখনই ফিরবেন। আপনি বিশ্রাম করুণ আমি আপনার খাবার নিয়ে আসছি।”

পীতাম্বর চৌধুরী মনীষাকে কাছে টানিয়া মাথায় ও পীঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, “না মা, বাড়ি গিয়ে চান-টান না করে আমি কিছু মুখে দেব না। অনর্থক তুমি ব্যস্ত হয়ো না। তার চেয়ে বরং তোমার সংগে একটু গল্প করি।”

মনীষা পার্শ্বের চেয়ারখানিতে উপবেশন করিল। পীতাম্বর চৌধুরী ব্যথিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—“তোমার এ বেশ কেন মা? এ যে সংসারবিমুখ তপস্বিনীর বেশ! এ বেশ তো তোমাকে মানায় না।” মনীষা কোন উত্তর না করিয়া নত হইয়া একমনে হস্তধৃত বইখানির পাতা উল্টাইতে লাগিল।

পীতাম্বর চৌধুরী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—“পোষ্টগ্রাজুয়েট ক্লাসে ভর্ত্তি হয়েছ তো? কি নিয়ে পড়ছো মা?”

মনীষা নম্রভাবে উত্তর করিল,—“আমি এখনও ভর্ত্তি হইনি কাকাবাবু। বাবা বারণ করলেন।”

ব্যারিষ্টার পীতাম্বর চৌধুরী ক্ষণকাল কি ভাবিলেন, হাসিয়া কহিলেন “এবার তাহলে উমাকে বিদায় দেবার তোড়জোড় চলেছে, কবে আমরা নেমন্তন্ন খাচ্ছি বলো?”

মনীষা শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে ও অসঙ্কোচে জবাব দিল, "বিয়ে আমি কোরব না কাকাবাবু।"

মনীষার কণ্ঠস্বরে পীতাম্বর চৌধুরী উদ্বিগ্ন হইলেন। মনীষার মাথায় হাত রাখিয়া তিনি বলিলেন—"ছিঃ একথা বলতে নেই। বাপের একটিমাত্র মেয়ে তুমি। একথা শুনলে তিনি কষ্ট পাবেন। তাছাড়া তোমার বাবা হলেন সমগ্র বাঙ্গালী-সমাজের মাথা। সারাদেশ তোমার আচরণ লক্ষ্য করবে। এ পাগলামো তোমার সাজে না। তোমার ঠাকুরদাকে দেখেছ ?"

অতি মোলায়েম কণ্ঠে মনীষা বলিল, "দেখিনি! তিনি ছিলেন এদেশের একজন সেরা বৈজ্ঞানিক। তার মত বিজ্ঞান-সাধক এদেশে একটাও জন্মায়নি। শিল্প-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই বংশের যে অবদান—তার তুলনা হয় না।"

"তোমাদের বংশের এই ধারা স্যার মৃগাঙ্ক সান্যালের সংগে সংগেই শেষ হয়ে যাবে। এ যে ভাবতেও পারি না।" কপট দুঃখ প্রকাশ করিয়া পীতাম্বর চৌধুরী তাঁহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন।

আধ্যাত্মিক-তত্ত্বালোচনার গুরুত্ব প্রকাশ করিয়া ও সেই প্রসঙ্গে মনীষাকে একটা শান্ত্বনাসূচক ভাব দেখাইয়া পীতাম্বর চৌধুরী বলিলেন, "লজ্জা করোনা মা। যারা জন্মায় তারাও মরে, কালের বুকে কোনো দাগ রেখে যায় না, তাদের কথা বলছি না। কিন্তু সংসারে যারা মানুষ বলে পরিচিত হতে চায়, কালের ইতিহাসে যাদের স্বাক্ষর অঙ্কিত করে যেতে চায়,

বিয়ে করা না করা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার নয় মা। তাদের পক্ষে এযে অবশ্যপালনীয় এক সামাজিক কর্ত্তব্য।"

এমন সময় নীচে পদশব্দ হইতে মনীষা উঠিয়া দাঁড়াইল "আমি এখন আসি কাকাবাবু। ঐ বাবা আসছেন।"

"একেবারে ব্রেকফাষ্ট সেরে এসেছ পীতাম্বর?" মৃগাঙ্ক সান্যাল এইরূপ নিশ্চিন্ত প্রত্যয়ের সংগে কথা কয়টি বলিলেন, মনে হইল যেন পীতাম্বরের উপস্থিতি সম্বন্ধে তিনি পূর্ব হইতেই নিঃসংশয় ছিলেন।

"না, আমি তো এই সবে আসছি। তাড়াতাড়িতে প্লেনে প্যাসেজ পেলুম না ট্রেনেই আসতে হলো। তোমার এখানেই এসে উঠলাম।" পীতাম্বর চৌধুরী উদাসীনভাবে কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করিলেন মনীষার সংযত ও সুস্পষ্ট ঘোষনাটাই এখনও তাহার মনের মধ্যে আলোড়িত হইতেছিল, 'আমি বিয়ে করবো না কাকাবাবু।'

স্যার মৃগাঙ্ক সান্যাল অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "তুমি তাহলে একেবারে খাওয়া-দাওয়া সেরেই এসো, কেমন? I have a long discussion with you. You know what it is all about from the papers. Don't you?" "Delhi is surprised over the news".

"But one can hardly get at the truth from the newspaper-reports." পীতাম্বর চেয়ারে হেলান দিয়া এক মুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিলেন।

মৃগাঙ্ক সান্যাল আসিয়া দাঁড়াইতেই মনীষা শশব্যস্তে গা

হইতে বর্ষাতিটা খুলিয়া লইল। বাহিরে তখনও অবিরলধারে বর্ষণ চলিতেছে। শ্রাবণের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মৃগাঙ্ক সান্যাল কন্যাকে কহিলেন, "তোমার কাকামনির খাবরটাও নিয়ে এসো।"

মনীষা অনাসক্তভাবে কহিল, "কাকামনি বলছেন তিনি বাড়ী না গিয়ে কিছু মুখে দেবেন না।"

"তুমি তাহলে আর দেরী করো না পীতাম্বর। রহমত তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে?"

মনীষা চলিয়া গেলে পীতাম্বর অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইয়া বসিয়া অনুচ্চস্বরে কহিলেন, "মনীষার এই সন্ন্যাসিনীর বেশ আমার ভাল লাগছে না মৃগাঙ্কদা। সকল শ্রেণীর লোক নিয়ে আমার কারবার, লোকের মন আমি তোমার চেয়ে ভাল বুঝি। মনে হয় মনীষা একটা বড় রকমের আঘাত পেয়েছে।"

পীতাম্বর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় কহিলেন, "বোঠান বেঁচে থাকতে তুমি তার দিকে নজর দাওনি—তারজন্যে পরে যথেষ্ট অনুতাপ ভোগ করেছ। অবশ্য তখন কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য অবিরাম তোমাকে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছিল। সে যুক্তি বা সান্ত্বনা এখন তোমার নেই। ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারলে বা ঠিক কাজটি না করলে যে অনুতাপ ভোগ করতে হয়, আমার এই কথাটি তুমি মনে রেখো।"

পীতাম্বর চলিয়া গেল কিন্তু তাহার এই শেষ কথা কয়টি স্যার মৃগাঙ্ক সান্যালের মনের মধ্যে কাঁটার ন্যায় বিঁধিয়া রহিল।

ক্ষণকাল পরে দ্বারপালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অরুণ আসিয়া

উপস্থিত হইল। এ বাড়িতে অরুণের যাতায়াত যদিও লৌকিক-শিষ্টাচারে কোন বিধিনিষেধের দ্বারাই সঙ্কুচিত নয়, তথাপি অন্যদিনের মত সরাসরি উপরে উঠিয়া না আসিয়া অগ্রে দ্বারবাণের দ্বারা যে অরুণ তাহার আগমন-সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিল, তাহার কারণ কারখানার ধর্মঘটের সহিত অরুণের পরোক্ষ যোগ থাকিতে পারে মৃগাঙ্ক স্যান্যালের কথাবার্ত্তায় এই ধরণের একটা অস্পষ্ট অভিযোগ প্রকাশ পাইয়াছিল। তাই পারিবারিক সৌহার্দ্দ্যের কথা ছাড়িয়া আপাততঃ অরুণ একজন অধীনস্ত কর্মচারীর যোগ্য শিষ্টাচার-সম্মত ব্যবহারই সমীচিন মনে করিল।

মনীষা পেয়ালায় কাফি ঢালিয়া দিতেছিল,—দ্বারবাণের মুখে অরুণের উপস্থিতির-সংবাদ শুনিয়া তাঁহার হাত কাঁপিয়া উঠিল। সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুতপ্রবাহ খেলিয়া গেল। অরুণ আসিয়া পূর্বের মতোই জেঠামণির পদধূলি লইল। তাহার ব্যবহারে কোনরূপ দ্বিধা কিংবা জড়তার লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। মনীষার উপস্থিতি অনুভব করিলেও মনীষার দিকে একবার তাকাইয়া দেখিল না। অরুণই আসিয়া ক্ষমা চাহিয়া তাহার মানভঞ্জন করিবে, মনীষার অভিমানী মন যখন একান্তভাবে ইহাই কামনা করিতেছিল সেইসময় অরুণের এই আগ্রহ-শূন্যতাকে তাহার প্রতি উপেক্ষা ও আর একদফা অপমান মনে করিয়া মনীষা ক্ষুব্ধমনে তৎক্ষণাৎ স্থানত্যাগ করিয়া যাইতেছিল। মৃগাঙ্ক সান্যাল কন্যাকে বলিলেন, “তোমার অরুণদাকে কাফি দিলে না মামণি।”

মনীষা ফিরিয়া দাড়াইল, সসঙ্কোচে কহিল, "ইনি কি অসময়ে খাবেন? প্রশ্নটা যে কাহাকে করা হইল, মনীষার নিজের কাছেই স্পষ্ট হইল না। অথচ উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া যাওয়াও সঙ্গত হইবে না। সে সংকুচিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

যেরাত্রে মনোরমার গৃহ হইতে মনীষা অশোভন ব্যবহার করিয়া চলিয়া আসিয়াছিল সেই রাত্রেই অরুণের একবার মনে হইয়াছিল মনীষার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত ভুল বুঝা-বুঝির নিরসন করিয়া লয়, আবার মনে হইল, "না আমি তো মনীষার প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার করিনাই" এই কথা মনে হইতেই তাহার মন বাঁকিয়া দাঁড়াইল।

তাহার পর হইতে এতগুলি ঘটনা এমনই দ্রুত ঘটিয়া গেছে যে অরুণের নিজের দিকে তাকাইবার কি নিজের কথা ভাবিবার সময় হয় নাই। এমন কি এখানে আসিলে মনীষার সহিত সাক্ষাৎ-সম্ভাবনার কথাটা পর্য্যন্ত তাহার মনে একবারও উদয় নাই। তাই মনীষাকে দেখিয়া সে নিজেও কম অপ্রস্তুত হয় নাই। তথাপি কি কথাবার্ত্তায় কি ব্যবহারে সে বিন্দুমাত্র প্রকাশ পাইতে দিল না।

বরং এবারেও অস্বস্তিকর অবস্থা হইতে সে-ই মনীষাকে নিস্কৃতি দিল, "আমি তো এসময় কিছু খাইনা জেঠামনি। সকালে যা খাবার সে তো খেয়েই এসেছি।" নিস্কৃতি পাইয়া মনীষা প্রস্থান করিল কিন্তু বোধ করি একেবারে চলিয়া গেল না—আড়ালে দাঁড়াইয়া সে সমস্তই শুনিতেছিল।

"আমাকে কেন ডেকেছেন জ্যাঠামণি!" অরুণের কথায় ছেলেবেলার আব্দারের সুরটি ফুটিয়া উঠিল, যদিও আজিকার দিনের সহিত সেসব দিনের পার্থক্য অনেক।

"তোমার বাবা এসেছেন জানো? তাকে আমিই তার করে আনিয়েছি। উচ্ছৃঙ্খল-শ্রমিকদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা যায় তার legal aspect নিয়ে আলোচনার জন্যেই পীতাম্বরকে আস্‌তে লিখেছিলাম। ধর্মঘটী-শ্রমিকদের সম্পর্কে যে ব্যবস্থা করি না কেন তা যে ধর্মঘটকারী শ্রমিক এবং যারা পিছন থেকে এই বেআইনী ধর্মঘটে ইন্ধন যোগাচ্ছে অথবা ধর্মঘটের মন্ত্রদাতা যারা তাদের কারওপক্ষেই উপদেয় হবেনা এটা তুমি সকলকে জানিয়ে দিও। শ্রমিকদের আমি এমন শিক্ষা দেব যাতে তারা আর কোনদিন মাথা তুলতে সাহস না পায়—এমন শিক্ষা দেব যেন মৃগাঙ্ক সান্যালের অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে কোনদিন এর পুনরাবৃত্তি না ঘটতে পারে—It will be a lesson for their lives".

এই কথার মধ্যে যে শ্লেষ প্রছন্ন ছিল তাহা অরুণকে বিদ্ধ করিল কিন্তু কোনরূপ উত্তেজনার বশবর্ত্তী না হইয়া সে ধীর ও নম্রভাবে উত্তর দিল,—"দুবেলা যারা পেটভরে খেতে পায় না, স্ত্রী-পুত্রের জন্য দুমুটো অন্ন যোগাতে উদয়াস্ত যাদের প্রাণান্তকর পরিশ্রম করতে হয়, ধর্মঘট তাদের পক্ষে বিলাস নয় জ্যাঠামণি। ধর্মঘট শ্রমিকের সর্বশেষ হাতিয়ার। একান্ত নিরুপায় না হলে এই শেষঅস্ত্র তারা কখনই প্রয়োগ করতে চায় না, কেননা এর জন্য যা দাম দিতে হয় তা লাভের অঙ্ক প্রায়ই ছাড়িয়ে যায়।

ধর্মঘটে যোগদান যে অন্ততঃ কর্মচ্যুতি না হলেও যে অন্ততঃ ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে যাবে নিশ্চয় একথা জেনেই তারা ধর্মঘটে নেমেছে।”

“তুমি তাহলে এই ধর্মঘট সমর্থন করছো?” অরুণের দিকে কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া পাইপের ফাঁক দিয়া স্যার মৃগাঙ্ক সান্যাল প্রশ্ন করিলেন।

অরুণ পূর্বের ন্যায় শান্তভাবে কহিল, “ধর্মঘটের অধিকার শ্রমিকের একটি মৌলিক অধিকার। ন্যায়সঙ্গত দাবী বা অভিযোগ উত্থাপন করে কর্ত্তৃপক্ষের কাছ থেকে সুবিধা যদি না পাওয়া যায়, মালিক যদি শ্রমিকদের মানুষ বলেই গ্রাহ্য না করে—অর্থ ও কর্ত্তৃত্বের দম্ভে তাদের ন্যায্য দাবী ও অধিকারকে যদি কেবলই পায়ে মাড়িয়ে চলতে থাকে তবে তার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সবরকম প্রতিবাদ করা প্রয়োজন। ধর্মঘট করলেও তা আমি সমর্থন করি, মালিকপক্ষের একজন হলেও আমি সমর্থন করতাম।”

“কোম্পানীর পরিচালক-সমিতির মধ্য থেকে শ্রমিকদের উচ্ছৃঙ্খল আইন বিরুদ্ধ আচরণ সমর্থন করার পরিণাম যে কি হতে পারে তা আশা করি তোমার স্মরণ করিয়ে দিতে আমায় বাধ্য করবে না।”

উত্তেজনা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়া আসিলে স্যার মৃগাঙ্ক সান্যাল অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে কহিল,—“শোনো অরুণ, তোমার উপর আমি অনেকখানি নির্ভর করেছিলাম। আমার সে আস্থা ও নির্ভরশীলতার অমর্য্যাদা করেছো কি তাকে ক্ষুণ্ণ

করেছ একথা আমি বলব না। আজ যে কোম্পানির মুনাফা অনেক বেড়েছে তার জন্য তোমার অবদান ও কৃতিত্ব, তাকেও আমি অস্বীকার করতে চাই না। তোমার উদ্ভাবিত মডেলগুলি এদেশে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হয়েছে। শ্রমিকেরা তোমাকে ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে। কারখানার উৎপাদন ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। তোমার সংঙ্গে আমার মতভেদ থাকলেও তোমার যোগ্যতাকে আমি এতদিন প্রীতির চক্ষে দেখে এসেছি। কিন্তু আমি ভুলেও ভাবিনি আমার উদাসিনতার সুযোগ নিয়ে তুমি অন্যায় উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দিতে পারো।"

চেয়ারে হেলান দিয়ে স্যার মৃগাঙ্ক সান্যাল দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—"হুঁ, আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আমি করব, কিন্তু শরীরের প্রতিটি রক্তকণিকা দিয়ে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি তাকে আমি নষ্ট হতে দেব না। আমার যে দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে তুমি আমার মুখের উপরেই বলতে পারলে ধর্মঘট সমর্থন করো সেই দুর্ব্বলতার জন্যেই আমি তোমাকে শাস্তি দেব না, কিন্তু জেনে রেখো এই একই অপরাধের জন্য আমি আমার নিজের ছেলেকে কঠোরতম শাস্তি দিতাম।"

শিল্পপতি দুই হাত টেবিলের উপর আড়াআড়িভাবে স্থাপন করিয়া সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিলেন, "কি চাও তোমরা বলতে পার? উৎপাদন চাও, দ্রব্যমূল্য হ্রাস চাও, বেশীসংখ্যক লোকের সংস্থান চাও—না বে-আইনী ধর্মঘট করে শিল্পের ধ্বংস চাও? কোনটা চাও বলতে পার? আজ যদি আমি কারখানা লক-আউট করে দিই তাতে ক্ষতি

হবে কার, ভূগবে কারা? আমি, না ধর্মঘটে উস্কানি দিয়ে যাদের তোমরা আত্মহত্যায় প্ররোচিত করছ তারা?"

শিল্পপতি একখানি প্রভাতি সংবাদপত্র টানিয়া লইয়া নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত ধর্মঘটের সর্বশেষ পরিস্থিতির প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। অরুণ এতক্ষণ নীরবেই শুনিয়া যাইতেছিল। উত্তর-প্রত্যুত্তর করিলে অনর্থক শুধু উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইবে মনে করিয়া স্যার মৃগাঙ্ক সান্যালের কোন একটা কথারও সে প্রতিবাদ করে নাই।

এবারেও অতিশয় নম্রভাবে কহিল, "ভূগবে তারাই, মালিকের খামখেয়ালী ও জুলুমের জন্য আবহমানকাল থেকে যারা ভুগে আসছে। কিন্তু তাদের মধ্যেও আজ মনুষ্যত্বের সাড়া জেগেছে—তবে একথা অস্বীকার করব না যে, মালিকের বেপরোয়া শোষণ ও অত্যাচারই আঘাত করে করে তাদের সুপ্ত মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তুলেছে।"

একটু হাসিয়া অরুণ পুনরায় কহিল, "ধর্মঘটে উস্কানি দিচ্ছে কারা তা আমার জানবার কথা নয় কিন্তু তারা যে শ্রমিকদের আত্মহত্যায় প্ররোচিত করছে না, বরং আত্মরক্ষায় উদ্বোধিত করছে, এ বিশ্বাস আমার আছে।"

অরুণ বলিয়া চলিল, "আমি এ কথাও বলব যে, যদি কেবলই ধর্মঘট করে, জোর করে, কি আইনের দ্বারা বাধ্য করিয়ে মালিকের কাছ থেকে দাবী ও প্রতিকার আদায় করতে হয় তবে তা সব সময় শিল্পের পক্ষে কল্যাণকর নাও হতে পারে। মালিক-শ্রেণীর হৃদয়ের পরিবর্ত্তনই সবচেয়ে

বাঞ্ছনীয় এবং কেবল এপথেই শ্রমিক-মালিক বিরোধের স্থায়ী সমাধান সম্ভবপর। কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিক যেদিন শ্রমিকগণকে নিজ শিল্প-পরিবারের সদস্য বলে মনে করবে, মনে করবে মালিক ও শ্রমিক শিল্পের সমান অংশীদার এবং মালিক যেদিন সত্যই বুঝবে যে, সন্তুষ্ট ও দক্ষ শ্রমিকেরাই শিল্পের আসল মূলধন সেইদিনই শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক মধুর হবে, শিল্পে নূতন যুগের স্থচনা হবে।”

সংবাদপত্রের রিপোর্টের উপর দৃষ্টি-নিবদ্ধ রাখিয়াই শিল্পপতি বলিলেন, “আমি পূর্বেও বলেছি এখনও বলছি, তোমার এই ভ্রান্ত-কেতাবী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তন চাই, নইলে দায়িত্বপূর্ণ-পদে অধিষ্ঠিত থেকে তুমি যে প্রতিষ্ঠানের অনিষ্টসাধন করবে, এ আমি কোন দিন ক্ষমা করব না অরুণ।”

* * *

তাঁহার ক্রোধে আরক্তিমমুখের থমথমে ভাব দেখিয়া মনে হইল তিনি অতিকষ্টে আত্মদমন করিয়া লইলেন। শিল্পপতি আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার বক্তব্য শেষ না হইতেই শয্যাপার্শ্বস্থিত টেলিফোনটা ক্রিং ক্রিং শব্দে বাজিয়া উঠিল। “তুমি এখন যেতে পার” অস্বাভাবিক রূঢ়ভাবেই অরুণকে বিদায় দিয়া শিল্পপতি তড়িতে ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

অরুণ বিষণ্ণভাবে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া অসিতেছিল —লাইব্রেরী ঘরের বারান্দা অতিক্রম করিবার সময় শুনিতে পাইল কে যেন পিছন হইতে বলিল—“শোনো।”

চমকিত হইয়া পশ্চাতে তাকাইতেই দেখিল মনীষা ফুলদানিতে রজনীগন্ধার একটি বড় গুচ্ছ ভরিয়া রাখিতেছে। একাজ মনীষার নয়—নির্জনকক্ষে প্রতীক্ষার সময়টাকে কোন না কোন কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিবার ছলমাত্র।

অরুণ অগ্রসর হইয়া নিরুৎসাহভাবে প্রশ্ন করিল,—"তুমি আমায় ডাকছিলে মনীষা?"

মনীষা ঝাঁঝালকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "গলার স্বরটাও আজকাল চিনতে পারো না নাকি?"

ইহা নিতান্তই গায়ে পড়িয়া ঝগড়া বাধাইবার কথা। অরুণের মন পূর্ব হইতেই বিষণ্ণ হইয়াছিল, তাই অযথা বাক্যব্যয় না করিয়া মনীষা আরও কঠোরতর কি বলিবে তাহারই জন্য সে শঙ্কিতভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিল। অরুণের এই নীরব অবস্থানকে মনীষা তাহার প্রতি উপেক্ষা মনে করিয়া দ্বিগুণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

—"বাবার সংগে কিসের কথা হচ্ছিল?"

—"কারখানার পরিস্থিতি নিয়ে, সে তোমার না শোনাই ভাল", অরুণ শান্তভাবে উত্তর করিল।

—"ভালো নয় কেন শুনি? তুমি কি জান না যে, বাবার সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিক আমি—তিনি আমাকে উইল করে দিয়েছেন। কারখানার জংলী কুলি-মজুর ক্ষেপিয়ে দিয়ে আমারই অধীনস্থ একজন কর্মচারী আমার বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে, কি নিজের স্বার্থ-সিদ্ধি করে নেবে এ আমি মুখ বুজে সহ্য করব ভেবেছ?"

এই অপ্রত্যাসিত রূঢ়-মন্তব্যে অরুণের শান্ত মুখশ্রী মুহূর্তে বিবর্ণ হইয়া গেল। সে বিষম উদ্বিগ্ন হইয়া অতিশয় কাতরভাবে বলিল—"এ তুমি কাকে কি বলছো? তুমি বৃথাই উত্তেজিত হয়েছ মনীষা। একটু স্থির হয়ে বসো, শান্ত হও। আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে বলছি। জেঠামনি আমাকে সন্দেহ কচ্ছেন, আমার উপর তিনি অপ্রসন্ন হয়েছেন। শেষে তুমিও কি আমাকে অবিশ্বাস করবে? সমস্ত না শুনে, সব কিছু না জেনে তুমি আমার দোষারপ করো না।"

অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় অরুণের এই মিনতিভরা কাতরোক্তিতে মনীষার রোষ-বহ্নি অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। ক্রোধে আত্মহারা হইয়া অরুণের মনের উপর সে নিষ্ঠুরতম আঘাত হানিল—"না, তোমার প্রলাপ শোনবার মতো যথেষ্ট সময় আমার নেই। বাবা যে দুধ-কলা দিয়ে এতদিন সাপ পুষেছিলেন এ আমি ভাবতেই পারিনি।"

কথা কয়টি বলিয়া মনীষা ঝড়ের-বেগে সোজা উপরে উঠিয়া গেল। অরুণ বজ্রাহতের ন্যায় কিছুক্ষণ নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া গাড়িতে গিয়া উঠিল।

উপরে উঠিয়া মনীষা নিজকক্ষে বিছানায় পড়িয়া বালিসে মুখ গুজিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। এই কয়দিন প্রতি-নিয়ত ঈর্ষানলে দগ্ধ হইয়া মনের তীব্র আক্রোশ মিটাইতে প্রতিহিংসা-বসে সে যাহা বলিয়া আসিল, এখন তাহাই শেল হইয়া তাহার বুকে বিদ্ধ হইল।

॥ আঠারো ॥

শ্রমিক-ব্যারাকের শেষপ্রান্তে গঙ্গার তীরবর্ত্তী একখানি বহু পুরাতন গৃহ। সংস্কারের অভাবে গৃহটি শেষ দশায় উপনীত হইয়াছে। শোনা যায়, গত শতাব্দীর শেষভাগে হুগলী নদীতে যখন জলদস্যুদের প্রচুর উপদ্রব ছিল, ইংরাজ রাজসরকার সে সময়ে জল-পুলিসদের থাকিবার জন্য এই গৃহ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহারা জলদস্যুদের হাত হইতে নিরীহ যাত্রীদের প্রাণ ও ধনরত্ন রক্ষা করিত। মৃগাঙ্ক সান্ন্যাল যখন কাশীপুরের জমীদার রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণের নিকট হইতে কারখানার জন্য জমি পত্তন লইলেন তখন এই ঘরখানিও উহার অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনার স্মারক বলিয়াই হউক তদবধি ইহা সম্পূর্ণ অব্যবহৃতই পড়িয়াছিল। বহুকাল যাবৎ ইহাকে ঘিরিয়া নানারূপ কাল্পনিক উপাখ্যান প্রচলিত থাকায় শ্রমিক ও জনসাধারণের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করিত। ইহার রুদ্ধদরজা কেহ কখনও অর্গলমুক্ত হইতে দেখে নাই। দিন-দুপুরেও এই পড়ো-বাড়িটার সম্মুখ দিয়া কেহ যাতায়াত করে না।

কাজেই এই পরিত্যক্ত-গৃহ সহসা এক রাত্রিতে অমাবস্যার অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া দুই-চারিটা লোকের নিঃশব্দ আনাগোনা কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না। মৃদু লণ্ঠনের আলো জমাট অন্ধকার ভেদ করিয়া বাহিরে প্রকাশ পায় না। গৃহাভ্যন্তরে একে একে যে স্বল্প-সংখ্যক লোক জমায়েত

হইয়াছে, তাহারা পরস্পর ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া কি বলিতেছে তাহার মর্মগ্রহণ করা সাধ্যাতীত। তবে যে, কোন ষড়যন্ত্র কি কোন গুপ্তবিষয়ের আলোচনা হইতেছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কিছু সময় পরে পরেই এক একজন প্রকাণ্ড গুরুভার দরজাটার একটা পাল্লা হঠাৎ উন্মুক্ত করিয়া যেভাবে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেছে ও কয়েক মুহূর্ত্ত সম্মুখস্থ অন্ধকার পথের পানে তাকাইয়া থাকিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া যাইতেছে, তাহাতে মনে হয় ইহারা কাহারও আগমন প্রতীক্ষা করিতেতেছে।

কিয়ৎকাল পরে ছিপছিপে পাতলা-চেহারার একজন লোক গুটিগুটি বাহিরে আসিয়া তখনই অত্যন্ত ব্যস্তসমস্তভাবে ভিতরে প্রবেশ করিল ও সংগে সংগে সেই ক্ষুদ্র দলটি চঞ্চল হইয়া উঠিল। উপানন্দ হাজরার পশ্চাৎ পশ্চাৎ স্যার মৃগাঙ্ক সান্ন্যাল বোধ করি এই প্রথম পড়ো-বাড়িটার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আর্স্র্‌লা ও চামচিকার উৎকট গন্ধে অবরুদ্ধ গৃহের ভারী-বাতাসে নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে। চুণ-বালি খসিয়া মেঝের উপর একটা স্থূল আস্তরণ তৈরী হইয়াছে। ছাদ হইতে বটের ঝুরির ন্যায় কালো-ঝুলের অসংখ্য সূক্ষ্ম জটাজাল নামিয়া আসিয়াছ। লণ্ঠনের মৃদু আলো দৃষ্টিকে পীড়িত করে; এই অনভ্যস্ত ক্লেশকর পরিবেশে শিল্পপতি স্যার মৃগাঙ্ক সান্যাল অম্লানবদনে আসন গ্রহণ করিলেন।

মিঃ উপানন্দ হাজরা উপবিষ্ট লোকগুলিকে একবার

স্থির-তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া একখণ্ড কাগজ শিল্পপতির দিকে মেলিয়া ধরিলেন ও মজুরদলপতিদের একজনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমরা সকলেই এসেছ তো—রহিম, গুরু বক্স, পিটার, মকবুল, গোমেজ, সুরপতি সবাই এসেছে।"

সমবেতকণ্ঠে চাঁপা-আওয়াজ হইল, "হাঁ হুজুর, আমরা সকলেই এসেছি।"

মিঃ হাজরা একে একে দলপতিদের প্রত্যেককে শিল্পপতির সহিত পরিচয় করাইয়া দিল। স্যার মৃগাঙ্ক সান্যাল কাহারও করমর্দন করিয়া, কাহাকেও প্রতি নমস্কার জানাইয়া, কাহারও স্কন্ধদেশ হৃদ্যতার সহিত ঝাঁকুনি দিয়া ও দুই একটি কুশল-প্রশ্নের দ্বারা সকলকেই যথোপযুক্ত প্রত্যাভিবাদনে আপ্যায়িত করিলেন। প্রবল-প্রতাপান্বিত মালিকের ব্যবহারে দলপতিগণ নিজেদের কৃতার্থ মনে করিয়া হৃষ্টচিত্তে আসন গ্রহণ করিলেন।

মিঃ হাজরা সর্বাগ্রে উঠিয়া বলিলেন "তোমাদের গতিবিধি কেউ টের পায়নি তো? শত্রুপক্ষ আমাদের কার্য্য-কলাপের উপর নজর রাখতে চাইবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। তাই সকলের অলক্ষিতে ঘোর অমাবস্যার রাত্রিতে নির্জ্জন স্থানে এই পরিত্যক্তগৃহে তোমাদের ডেকেছি। সাবধান, এখানে যে আলোচনা হবে তা যেন ঘুণাক্ষরেও বাইরের লোক না জানতে পারে। এর একটি কথাও যদি বাইরে প্রকাশ পায় তবে আমাদের সকল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে, আর তার পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি কি জান?"

চাপাগলায় সকলে বলিয়া উঠিল—"মৃত্যু"।

মিঃ হাজরা আসন গ্রহণ করিতেই শিল্পপতি উঠিয়া গুরু-গম্ভীর স্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন "সারা ভারতবর্ষে আমার বিভিন্ন শিল্পের চব্বিশটি কারখানায় প্রায় লক্ষাধিক শ্রমিক-কর্মচারী কাজ করে। আমার এতগুলি প্রতিষ্ঠানে এই লক্ষাধিক পরিবারের প্রায় পাঁচ লক্ষ লোকের অন্নসংস্থান হয়। আমার সমস্ত কারখানা 'লক্-আউট' করলে আমার কিছু যায় আসে না—শিল্পে অনগ্রসর আমাদের এই শিশুরাষ্ট্রের উৎপাদন ব্যাহত হবে—দরিদ্র দেশের কোটি কোটি টাকায় বিদেশী বণিকদের উদর স্ফীত করবে; এবং তার চেয়েও বড় কথা লক্ষাধিক শ্রমিক-কর্মচারীর জীবিকা নষ্ট হলে, পাঁচ লক্ষ লোক নিশ্চিত অনাহারের সম্মুখীন হবে।"

একটু থামিয়া শিল্পপতি পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন "এতগুলি কারখানা থেকে বৎসরে যে লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা হয় তার একটি পয়সাও আমি নিজের জন্য গ্রহণ করি না—শ্রমিক-কর্মচারীদের কল্যাণকর কার্য্যে ব্যয়িত হয়ে উদ্বৃত্ত যা থাকে, তা প্রতি বছর নূতন নূতন গবেষণা ও নবতর শিল্প-প্রচেষ্টার মধ্যেই নিয়োজিত হয়ে যাতে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পায়, দেশ আত্মনির্ভরশীল হয় এবং দেশে বেকারের সংখ্যা হ্রাস পায় সেই প্রচেষ্টা করা হয়। কাজেই সম্পূর্ণরূপে দেশের জনসাধারণের স্বার্থেই এইসব কারখানা পরিচালিত হয়।"

—"আমি জানি শ্রমিক-কর্মচারীদের শতকরা নিরানব্বইটি লোক শান্তি চায়, নিজ নিজ কাজে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে

ব্যক্তিগত আর্থিক উন্নতিসাধনই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। বাকী একভাগ লোকই কেবল তাদের দুর্বুদ্ধি ও অপরিণামদর্শীতার জন্য রাজনৈতিক দল বিশেষের ভ্রান্তপথে পরিচালিত হয়ে কারখানার মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি করে। দেশের বেশীরভাগ লোকের প্ররোচনায় এমনই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে যে নিজেদের কিসে ভাল হবে সেটুকু বিচার বুদ্ধিও তাদের লোপ পেয়ে যায়।"

এই মুষ্টিমেয় লোক পাঁচ লক্ষ লোকের ভাগ্য নিয়ে ছিনি-মিনি খেলবে, দেশের সম্পদ নষ্ট করবে, দেশের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে দাঁড়াবে, সভ্য সমাজ তা কিছুতেই সহ্য করবে না। তোমরা শতকরা নিরানব্বই জন লোক যারা শান্তি চাও নিয়ম শৃঙ্খলা চাও, তারা কি এই অন্যায় উপদ্রব মুখ বুজে সহ্য করবে? জুলুমবাজি ও ভীতি প্রদর্শনের কাছে অসহায়ভাবে আত্ম-সমর্পণ করবে, না নিজেরা সংঘবদ্ধ হয়ে একে প্রতিরোধ করবে।

মজুর-সর্দারেরা এতক্ষণে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চুপ করিয়া শুনিতে ছিল। সকলে একযোগে বলিয়া উঠিল, "আমরা সহ্য করবো না, প্রতিরোধ করব।"

শিল্পপতি বলিলেন, "আমি জানি এই ক'দিন ধর্মঘটের ফলেই সহস্র সহস্র শ্রমিক-পরিবারে হাহাকার উঠেছে—অর্ধাহারে ও অনাহারে তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা মরতে বসেছে। ধর্মঘট এদের পক্ষে মস্ত অভিশাপ তাই এরা মনে-প্রাণে ধর্মঘটের অবসান কামনা করছে। এরা আজ তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে —তোমরাই দুর্বৃত্তদের হাত থেকে এদের রক্ষা করবে, দুষ্কৃতি-কারীদের বিরুদ্ধে এদের অভয় প্রদান করবে, সহকর্মীদের হাত

ধরে অবিলম্বে কাজে যোগ দিয়ে সত্যিকারের বাঁচবার রাস্তা দেখিয়ে দেবে।

শিল্পপতি দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিলেন, "আমি আজ এই কথাই তোমাদের বলতে এসেছি যে দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে তোমাদের সংঘবদ্ধ-প্রচেষ্টাকে কোম্পানি সকল রকমে সাহায্য করবে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রতিরোধে, দুর্ব্বৃত্ত দমনে কোম্পানি তোমাদের সংগে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত এবং এই কার্য্যে তোমরা যে সরকারের সমর্থন ও সাহস লাভ করবে এই আশ্বাসও আমি তোমাদের দিচ্ছি। কেননা শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠাই সরকারের কাম্য।"

শিল্পপতি ঘাড় ফিরাইয়া মিঃ হাজরার সহিত কয়েক সেকেণ্ড কি কথাবার্ত্তা বলিলেন। অতঃপর টেবিলের উপর রক্ষিত কাগজখণ্ড হইতে শ্রমিক দলপতিদের একজনকে সম্বোধন করিয়া জানিতে চাহিলেন,—"পিটার, তোমার অধীনে ক'জন আছে?"

সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া পিটার নম্রভাবে বিশুদ্ধ ইংরাজিতে উত্তর করিল, "আমি মনে করি বয়লার ডিপার্টমেণ্টের সকলেই আমার কথা শুনবে।"

"রহিম তোমার তাঁবে আছে কতজন?"

শ্রমিক-ব্যারাকের উনিশ-নম্বর ব্লকের দু'শো লোক আমার কথায় উঠে-বসে হুজুর।"

"গুরুবক্স, তোমার?"

"শিখ-সম্প্রদায়ের যত লোক এই কারখানায় কাজ করে আমার কথা তারা আমান্য করবে না।"

শিল্পপতি পূর্বাপেক্ষা গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "আশ্চর্য্য, আমি ভাবছি তোমাদের অধীনে এত লোক থাকতে ধর্মঘট আজও চলছে কি করে।"

শিল্পপতি বলিয়া চলিলেন "ধর্মঘটে যারা উস্কানি দিচ্ছে, কারখানার মধ্যে যারা অশান্তির বীজ ছড়াচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা ঐক্যবদ্ধ হও, সংঘবদ্ধ হও। কোম্পানি ও সরকার তোমাদের পক্ষে। শান্তি ও শৃঙ্খলার শত্রুদের চিহ্নিত করে রাখো, জনমতের দরবারে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে একদিন চরমদণ্ড তাদের মাথা পেতে নিতে হবে।"

স্যার মৃগাঙ্ক সান্যালের বক্তব্য শেষ হইলে সকলেই প্রস্থানদ্যোত হইল। মিঃ উপানন্দ হাজরা ইঙ্গিতে রহিম ও সুরপতিকে বসিতে বলিয়া শিল্পপতিকে গুপ্ত দ্বারপথে কারখানার বাহিরে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলেন। শ্রমিকাসর্দারগণও পৃথক পৃথক ভাবে এক এক পথ ধরিয়া স্ব স্ব গন্তব্যস্থানের দিকে যাত্রা করিল।

মিঃ উপানন্দ হাজরা যখন ফিরিয়া আসিলেন অন্ধকার পোড়ো বাড়িটার মধ্যে রহিম ও সুরপতি ছাড়া একটা কাক-পক্ষীও ছিল না। চারিদিক অধিকতর থমথমে ভাব ধারণা করিয়াছে। দূরবর্ত্তী লোকালয়-গুলিতে জনকোলাহল অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়াছে।

মিঃ উপানন্দ হাজরা লণ্ঠনের আলোটা কমাইয়া প্রায় নিভ নিভ করিয়া একপাশে সরাইয়া রাখিলেন ও চেয়ারটা টানিয়া অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইয়া বলিলেন "এখন নিয়ে এসো"

সুরপতি গৃহের এক কোণে চূণ-বালির পলস্তরার স্তূপের মধ্য হইতে একটা বিলাতী মদের বোতল বাহির করিয়া আনিয়া মিঃ হাজরার হাতে দিল। মিঃ হাজরা উহাদের দুইজনকে দুই গ্লাস ঢালিয়া দিয়া নিজেও এক গ্লাস লইলেন—"লেট্‌স্ ড্রিঙ্ক ওয়ান এনাদারস্ হেলথ।"

"সংঘবদ্ধ হও, প্রতিরোধ কর,—" আই ক্যান্ ইজিলি টেক সেন্টার আণ্ডার দিজ ক্যাচওয়ার্ডস্। শান্তি ও শৃঙ্খলার যারা শত্রু, কারখানার মধ্যে যারা অশান্তির বীজ ছড়াচ্ছে তাদের চরম দণ্ড দিতে হবে, বুঝলে সুরপতি। আই হ্যাভ অন্‌লি টু মেক ইট এ্যাপপিয়ার য়্যাজ অ্যান এ্যাক্‌সিডেন্ট, এ চান্স ওকারেন্স ইন্ এ ফ্রেকাশ বিট্যুইন রাইভেল ফ্যাকশানস্।"

মিঃ উপানন্দ হাজরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বেধড়ক হাসির বিকট শব্দ মুহূর্ত্তের জন্য অন্ধকারের বুক চিড়িয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল। বহু বৎসরব্যাপী গবেষণার পর ঈপ্সিত ফল লাভ করিলে, বিজ্ঞানীর যেমন সন্তোষ ও পরিতৃপ্তি লাভ হয়, সেইরূপ প্রসান্ত আত্মতৃপ্তির সহিত মিঃ হাজরা অনুচ্চস্বরে ডাকিলেন, "রহিম"।

রহিম নিরাসক্তভাবে উত্তর করিল,—"কি বলবেন জানি স্যার। আপনার নিমক খেয়েছি আপনার জন্যে জান ভি কবুল করতে পারি। কিন্তু ছোট সাহেব দেবতা। ওনার গায়ে হাত তুললে হাতে পক্ষাঘাত হবে হুজুর। খোদার কসম, ওটি পারব না।"

"বুঝেছি।" মিঃ হাজরা প্যাণ্টের পকেট হইতে একতাড়া

নোট বাহির করিয়া রহিমের দিকে আগাইয়া দিলেন। "নে গুনে দেখ।"

আনকোরা নোটগুলি অন্ধকারে রহিমের লুব্ধদৃষ্টির সম্মুখে জ্বল জ্বল করিতে লাগিল। রহিম ব্যগ্রভাবে দুইবাহু প্রসার করিয়া নোটগুলি টানিয়া লইল ও একখানি করিয়া গুনিয়া দন্তবিস্ফারিত করিয়া বলিল, "বলুন কি করতে হবে, মজুরি পেলে রহিম শেখ করতে না পারে এমন কাজ নেই।"

রহিমকে কাছে টানিয়া মিঃ উপানন্দ হাজরা ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিলেন……একদম শেষ করে ফেলতে হবে…… "হ্যা শোন, কতকগুলি লোক জুটিয়ে একটা গোলমাল-হাঙ্গমা বাঁধিয়ে নিবি বুঝলি। এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করে নিবি যাতে মনে হবে দুইদল শ্রমিকের মধ্যে সংঘর্ষের ফলেই আকস্মিক ভাবে ঘটনাটা হয়েছে। সাবধান, কেউ যেন না বুঝতে পারে এর সংগে আমার বিন্দুমাত্র সংস্রব আছে। যদি ঠিকভাবে কাজ হাসিল করতে পারিস তোর জন্যে এই আরো দুশো টাকা বাঁধা রইল। মিঃ হাজরা পকেট হইতে একটা নোটের বাণ্ডিল বাহির করিয়া আবার পকেট পুরিয়া রাখিলেন।

"এই বুধবারেই ধর্মঘটী-শ্রমিকদের একটা সভা হওয়ার কথা আছে। ঐ দিনেই তোর লোকজন সব ঠিক রাখিস।"

মিঃ উপানন্দ হাজরা উঠিয়া অন্তরঙ্গভাবে সুরপতির কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন, "কিছুদিন তোমার শালিকাটিকে চোখে চোখে রেখো সুরপতি।"

॥ উনিশ ॥

কর্ত্তৃপক্ষের পরোক্ষ হস্তক্ষেপের ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হইল। শ্রমিকদের মধ্যে ছোট-খাট সংঘর্ষ বাঁধিয়া আন্দলোনকে হিংসার গুপ্তখাতে প্রবাহিত করিয়া দিল। অপোষ-আলোচনার দ্বারা মীমাংসার আশাও আর রহিল না। দক্ষশিকারী উপানন্দ হাজরা এই বিক্ষুব্ধ প্রবাহে ছিপ ফেলিয়া মৎস্য শিকারে প্রবৃত্ত হইল।

পূর্ব নির্দ্ধারিত দিনে ধর্মঘটের সমর্থনকারীদের আহূত একটি সাধারণসভাকে কেন্দ্র করিয়া উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কর্ত্তৃপক্ষের সমর্থনপুষ্ট পেটোয়া লোকদের দ্বারা সভার কার্য্যে বাধাদানের চেষ্টায় উত্তেজনা প্রবলাকার ধারণ করে। অদূরে মোতায়েন পুলিসবাহিনী ইহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। এই সুযোগে তাহারা জনতাকে মৃদু যষ্ঠি সঞ্চালনে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয় ও ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া পলাইতে থাকে, কিন্তু আনাচে-কানাচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া উত্তেজনাকে জীয়াইয়া রাখিবার চেষ্টা করে। কারখানার যে সদর রাস্তাটা বি টি রোডের সহিত মিশিয়াছে তাহার সংযোগস্থলেও এইরূপ একটি বিক্ষিপ্ত দল জমায়েত হইয়া নানাপ্রকার উত্তেজনাকর ধ্বনি করিতেছিল। অরুণ কারখানা হইতে উত্তর দিককার যান-বাহন চলাচলের জন্য নির্দিষ্ট জনহীন নিভৃত পথ দিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বি টি রোড ধরিয়া নিজেই গাড়ী চালাইয়া আসিতেছিল। উত্তেজিত জনতার নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র গাড়ির গতি স্বভাবতঃই অনেকটা মন্থর হইয়া আসিয়াছে। তাই জনতার মধ্য হইতে এই সময়ে

অরুণকে লক্ষ্য করিয়া যে নানারূপ মন্তব্য বর্ষিত হইতেছিল, প্রচণ্ড কোলাহলের মধ্যেও তাহার দুই-চারিটা উক্তি অরুণ বেশ স্পষ্টই শুনিতে পাইয়াছিল।

একজন বলিল, "ঐযে ছোট সাহেব গাড়ি হাঁকিয়ে চলেছেন।"

অন্য একজন প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "ছোটসাহেব কিরে, জামাইবাবু বল্।" সকলে হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

তৃতীয় একজন বলিল, "যাঃ কি বাজে বকছিস্, শুনতে পাবে যে! ছোটসাহেবের সংগে কি আর কারও তুলনা হয়? শ্রমিকের এতবড় হিতৈষী বন্ধু দেশে আর ক'টা আছে শুনি'। নেতাদের অনেককেইতো দেখলাম—এদের হাতে শ্রমিকেরা রাজনৈতিক দাবাখেলার গুটি।"

আর একজন ফোড়ন দিল—"ইলেকশন-সমুদ্র পার হওয়ার জন্যেই শ্রমিকের কাঁধে ভর কচ্ছেন।"

অন্য একজন যোগ করিল,—"শ্রমিকের মাথায় পা দিয়ে একবার কোন রকমে মন্ত্রীত্তের গদিতে উঠে বসতে পারলে শ্রমিককে লাথি মেরে ফেলতে কতক্ষণ!"

অপর একব্যক্তি দুই হাতে ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখে আসিয়া কহিল—"আরে সব বেটাকেই চিনি। শ্রমিকের বন্ধুই যদি হবে, ধর্মঘটের মধ্যে অফিসে আসবার দরকারটা কি শুনি। শ্রমিকের জন্য অতই যদি দরদ, পারেন না উনি শশুরকে বলে শ্রমিকদের দাবী আদায় করে দিতে।"

সকলে উচ্চহাস্যে তাহাকে অভিনন্দিত করিল। উৎসাহিত হইয়া সে বলিতে লাগিল—"উপরে সবাই অমন ভাল-মানুষ,

তলে তলে নিজের কাজ ঠিক গুছিয়ে নিচ্ছেন। চলতো জিজ্ঞাসা করে আসি এই নতুন গাড়িটা কি নিজের টাকায় কেনা হলো, না কোম্পানির টাকায় ?"

একদল লোককে ঠেলিয়া লইয়া লোকটা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সময় পশ্চাতের ভিড়ের মধ্য হইতে কেবা গাড়ির পিছনের চাকা লক্ষ্য করিয়া বর্শাফলকের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র ছুঁড়িয়া মারিতেই বিকট শব্দে গাড়ির টায়ার ফাটিয়া গেল। কিয়দ্দূর গিয়া গাড়িখানা অচল হইয়া পড়িল।

বহু লোক নানারূপ বিদ্রুপাত্মক ধ্বনিও মন্তব্য করিতে করিতে গাড়ির চারিপাশে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। অরুণ বাহির হইয়া গাড়ির টায়ার পরীক্ষা করিতেছিল। একদল লোক মৌখিক সহানভূতি প্রকাশ করিতে করিতে আসিয়া প্রায় তাহার গায়ের উপরেই ঝুঁকিয়া পড়িল। আর অমনি পিছন হইতে ভীষণ লুটোপুটি ঠেলাঠেলি আরম্ভ হইল। এই হুড়াহুড়ির মধ্যে কে একজন অতর্কিতে অরুণের মাথায় ও কুক্ষিতে ছোরা মারিয়া ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন করিল। গভীর ক্ষতস্থান দুইটা হইতে ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিতে লাগিল। কুক্ষিতে হাত চাপিয়া অরুণ বসিয়া পড়িল।

এই অভাবিত পরিস্থিতে সকলেই আতঙ্কিত হইয়া ছুটিয়া পলাইল। দেখিতে দেখিতে জনপূর্ণ বি টি রোডটা একটা বিজন প্রান্তরে পরিণত হইল। কেবল অরুণের অচেতন দেহটা মাটিতে লুটাইতে লাগিল।

অরুণের একবার চোখ পড়িলেই অরুণ তাহাকে ঘিরিয়া

ফেলিবে এইভয়ে সুরপতি ভিড়ের মধ্যে না গিয়া প্রথম হইতেই দূরে দাড়াইয়া ঘটনার গতি লক্ষ্য করিতেছিল। আর সকলে যখন পলাইয়া আত্মরক্ষা করিল তখনও সুরপতি একটা বড় গাছের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া রহিল। অরুণের সংজ্ঞাহীন দেহ জনশূন্য রাস্তার উপরে মাটিতে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া সে গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল। হত্যাকাণ্ডের সহিত তাহার বিন্দুমাত্র সংশ্রব থাকিতে পারে এই সন্দেহও যাহাতে কাহারও মনে উদিত না হয় তাহার জন্যই সুরপতি অগ্রে গিয়া মনোর মা ও রমাকে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা জানাইল।

শুনিয়া মনোর মা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। স্বভাবতঃ ধীর-স্থির ও গম্ভীরপ্রকৃতি, বুদ্ধিমতী রমা বাহিরে এতটুকু কাতরতা প্রকাশ না করিয়া তৎক্ষণাৎ লণ্ঠন হস্তে বাহির হইয়া আসিল। মনোরমা ও সুরপতি তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া চলিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে অন্ধকার রাত্রির কৃষ্ণ যবনিকা নামিয়া আসিয়াছে।

সুরপতিকে অবিলম্বে একখানা এ্যাম্বুলেন্স কি একটা ট্যাক্সি ডাকিতে বলিয়া রমা অতি সন্তর্পণে অরুণের রক্তাপ্লুত মাথাটা কোলের উপর তুলিয়া লইয়া ক্ষতস্থান দুইটি হাতে চাপিয়া বসিয়া রহিল। লণ্ঠনের আলোকে তাহার বিষাদ-মলিন মুখের উপর ওষ্ঠাধরের মৃদু কম্পন ভিন্ন আর কোন চাঞ্চল্য দেখা গেল না। অরুণের বলিষ্ঠ দেহে শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে। নিমীলিত দুই চোখের কোনে দুই ফোঁটা অশ্রু তখনও নিদারুণ যন্ত্রনার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। অপলক দৃষ্টিতে রমা সেই করুণ দৃশ্য

দেখিতে দেখিতে দুই ফোঁটা অশ্রু অলক্ষে গড়াইয়া পড়িল।

ট্যাক্সি আসিতেই রমা মাকে বাসায় ফিরিয়া যাইতে বলিয়া রমা সুরপতি ও ট্যাক্সি চালকের সাহায্যে আহত অচৈতন্য অরুণকে সাবধানে ট্যাক্সিতে তুলিয়া লইল। আধ ঘণ্টার মধ্যে ট্যাক্সি কলিকাতায় একটি সুপ্রসিদ্ধ সরকারী হাসপাতালের এমার্জেন্সী ওয়ার্ডের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। শহরের শিক্ষিত ও অভিজাত মহলে তাঁহার মর্য্যাদা ও জনপ্রিয়তার জন্যই প্রশংসনীয় তৎপরতার সহিত অস্ত্র-চিকিৎসার পর একটি উৎকৃষ্ট ক্যাবিনে অরুণের স্থান হইল।

রাত্রি অধিক হইয়াছে। অরুণের তখনও জ্ঞান ফিরিয়া আসে নাই। শিথানের কাছে রমা একখানি বেঞ্চির উপর বসিয়া নির্ণিমেষ নেত্রে অরুণের বেদনাক্লিষ্ট মুখের পানে তাকাইয়া আছে।

দেয়াল ঘড়িটায় টিক টিক করিয়া দুইটা বাজিল। সমগ্র ওয়ার্ডটি নিথর নিস্তব্ধ। কেবল দুই একটি মুমূর্ষ রোগীর কাতর গোঙানি ও কর্মরতা সেবিকাদের পদশব্দে নিশীথ রাত্রির নিস্তব্ধতা থাকিয়া থাকিয়া বিদীর্ণ হইতেছে। পলকহীন দৃষ্টিতে অরুণের দিকে তাকাইয়া রমা ভাবিতেছে তাঁহার জীবনটাকে লইয়া ভাগ্যদেবী কি নিষ্ঠুর খেলায় মাতিয়াছেন। এক একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনার স্রোত ভাসিয়া তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়—অরুণের এই আকস্মিক দুর্ঘটনার ঝটিকাহত খরস্রোত আবার তাঁহাকে কোথায় ভাসাইয়া লইবে কে জানে। এই ভাবে জীবনভর তাহাকে কি কেবল ভাসিয়াই বেড়াইতে

হইবে— একটিবারও কি সে তীরে আসিয়া একটু সুস্থির হইতে পারিবে না !

উড্ডয়ণ-প্রয়াসী পক্ষী শাবকের ডানার ঝটপটানির মত অরুণের ক্লান্ত চোখের দুইটি পাতা কয়েকবার ঈষৎ উন্মোচিত হইয়া আবার নিমীলিত হইল। রমা অপরিসীম আগ্রহে অরুণের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল--তাঁহার শুষ্ক প্রাণে আশার বারিধারা সিঞ্চিত হইল।

অরুণ আকর্ণ-বিস্তৃত চক্ষু দুইটি মেলিয়া স্থিরদৃষ্টিতে রমার দিকে তাকাইয়া বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিল, "তুমি ?" বরষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশে ক্ষণিক সূর্য্যের ম্লান হাসির মত অরুণের যন্ত্রনাকাতর মুখের উপর একটু ক্ষীণ হাসির আভা ফুটিয়া উঠিল।

"আমি এখানে কেন ? তুমি কি করে এলে ?" বলিতে বলিতে রমার দিকে পাশ ফিরিয়া শুইতে গিয়া অরুণ অসহ্য যন্ত্রনায় অর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। কপালের উপর স্বেদ বিন্দুগুলি টলমল করিতেছে। রমা বিন্দুমাত্র ইতঃস্তত না করিয়া দুইহাতে ধরিয়া অতিশয় সতর্কতার সহিত অরুণকে পূর্বের অবস্থায় শোয়াইয়া রাখিল।

মুখে বলিল,—"এ অবস্থায় আপনি একটুও নড়াচড়া করবেন না, অরুণবাবু। ডাক্তারের নিষেধ আছে। এটা হাসপাতাল। আজ সন্ধ্যায় আপনি এ্যাক্‌সিডেণ্ট করেছিলেন।

ক্ষণকালের জন্য অরুণের নিভাঁজ ললাটে বলিরেখা উৎকীর্ণ হইল। ঘন-কৃষ্ণ-বঙ্কিম-ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হইল।

বোধ করি সন্ধ্যাকালীন দুর্ঘটনার কথাই স্মরণ করিবার জন্য সে স্মৃতির সমুদ্র মন্থনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

অরুণ কিছুটা প্রকৃতিস্থ হইয়া রমার দুইখানি হাত বুকের উপর টানিয়া লইল। পাছে রমা হাত সরাইয়া লয় এই আশঙ্কায় সজোরে চাপিয়া ধরিয়া শান্ত পরিতৃপ্তির মধুর হাসি হাসিয়া কহিল,—"ভালই হয়েছে, এ্যাকসিডেন্ট না হলে হয়ত কেনদিনই তোমাকে এত কাছে পেতাম না রমা। তোমার দিদির অসুখের সময় তোমার অনলস পরিচর্য্যা দেখে আমার লোভ হতো। তোমার মিষ্টি হাতের সেবাযত্ন পাওয়ার সুযোগ ভগবান আজ ঘটিয়ে দিয়েছেন।"

এক সংগে এতগুলি কথা বলিয়া অরুণ হাঁপাইতে লাগিল। বোধকরি ক্ষণকাল পূর্বে অরুণের আর্ত্তনাদেআকৃষ্ট হইয়াই একজন সেবিকা সহসা অরুণের কেবিনে আসিয়া উপস্থিত হইল। অবসন্নদেহে অরুণ বুকের উপর রমার হাত চাপিয়া ধরিয়া নির্জীবের ন্যায় পড়িয়াছিল। অরুণ ব্যথিত হইবে ভাবিয়া রমাও হাত ছাড়াইয়া লইবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিল না।

নার্স গম্ভীর হইয়া আদেশের সুরে কহিল,—"রোগীর জ্ঞান ফিরেছে। এখন আর আপনার এখানে থাকা উচিত হবে না রমাদেবী. এতে ওর অবস্থার আরও অবনতি হতে পারে।"

রমা জানিতে চাহিল রোগীর বাড়ীতে পিতামাতাকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে কিনা। নার্স অধিকতর কর্কশ ও ঝাঁঝালো-কণ্ঠে উত্তর করিল, "সে প্রশ্ন এখানে নয়। রোগীর মনে এতটুকু চাঞ্চল্য জাগতে পারে এমন কোন আলোচনাই যে

এখানে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় এটুকু আপনার বুঝা উচিত রমাদেবী।

রমা আর কোন বাক্যব্যয় না করিয়া অরুণের করধৃত হাতখানি ধীরে ধীরে ছাড়াইয়া লইল। আহত অরুণের নিকট হইতে বিদায় লইতে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। নিজের দুর্ব্বলতা গোপন করিবার জন্যই অন্যদিকে মুখ ঘুরাইয়া লইয়া বেদনাজড়িত কণ্ঠে বলিল, "এখন আসি অরুণ বাবু," এই কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়া সংগে সংগে উঠিয়া দাড়াইল ও সোজা একেবারে দরজার বাহিরে চলিয়া গেল। অরুণের ক্লান্ত দুইচোখের করুণ দৃষ্টিও তাহাকে অনুসরণ করিয়া চলিল।

রমা অদৃশ্য হইবামাত্র পুনরায় অরুণের সংজ্ঞা লুপ্ত হইল। রমা যখন কেবিনের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন বিহগ-কুলের প্রভাতী সঙ্গীত আরম্ভ হইয়াছে। রাত্রি জাগরণে এতক্ষণ তাহার কোনই ক্লেশ হয় নাই, কিন্তু এখন সহসা দুইচোখ ঘুমে জড়াইয়া আসিল, দুইপায়ের গতি শ্লথ হইয়া আসিল। মনে হইল যেন তাহার তন্দ্রালস-দেহ এখনই মাটিতে লুটাইয়া পড়িবে। হাসপাতালের দরজায় পৌঁছিবামাত্র একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর কানে আসিতেই রমা চমকাইয়া উঠিল।

"রমাদি তুমি ?" মৃদুলা কাছে আসিয়া উৎসুক দৃষ্টি মেলিয়া তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। পার্শ্বে ভিজিটরস্‌দের ওয়েটিংরুমের দিকে তাকাইয়া রমা বুঝিল, চেয়ারে উপবিষ্ট প্রৌঢ়-বয়স্ক ভদ্রলোক ও মহিলাটি অরুণ চৌধুরীর বাবা পীতাম্বর চৌধুরী ও মা দয়াময়ী ছাড়া আর কেহ নয়। ইহারা নিশ্চয়ই অরুণের সংবাদ জানিবার জন্য বসিয়া আছেন।

রমা সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "অরুণবাবু এখন অনেকটা ভালই আছেন মৃদুলা। আর কোন ভয় নেই।" ততক্ষণে দয়াময়ীও কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

দয়াময়ী রমার দুটি হাত জড়াইয়া ধরিয়া আবেগকম্পিত স্বরে বলিল, "আমি সব শুনেছি মা। আমার অরুণকে তুমিই বাঁচিয়েছ। কী দিয়ে যে আমরা তোমার ঋণ শুধবো।"

রমা হাসিয়া কহিল, "সে হবে মা। অরুণবাবুতো সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠুন।"

সম্মুখের দিকে পা বাড়াইতেই দয়াময়ী ব্যস্ত হইয়া কহিল, "তুমি এখন কোথায় যাবে মা?—আমাদের ড্রাইভার তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে'খন, সারারাত জেগে এখন আর ট্রামে-বাসে গিয়ে কাজ নেই তোমার।"

রমা বাঁধা দিয়া বলিল, "তার আর প্রয়োজন হবে না মা। আমি বেশ সুস্থই আছি। রাত জাগা আমার অভ্যাস আছে। আপনি ভাববেন না। আমি একাই বেশ যেতে পারবো।"

রমা চলিয়া গেলে দয়াময়ী মুগ্ধ হইয়া যাত্রাপথের দিকে তাকাইয়া রহিল। রমা ভাবিতেছিল, মনীষা কী খবর পায় নাই।

॥ বিশ ॥

রাত্রি প্রভাত হইতেই এই নৃশংস-কার্য্যের কথা সমস্ত শহরে দাবানলের ন্যায় ছড়াইয়া পড়িল। প্রভাতী সংবাদপত্রগুলিতে প্রথম পৃষ্ঠায় দুইকলম ব্যাপী বড় হরপে শিরোনামায় প্রকাশিত

সংবাদ, "মালিকের গুপ্তচর" কর্ত্তৃক শ্রমিকদরদী অরুণ চৌধুরীকে হত্যার চেষ্টাকে শহরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আহত অরুণ চিকিৎসাধীনে আরোগ্য লাভ করিতেছে কি অন্ততঃ মৃত্যুর আশঙ্কা কাটাইয়া উঠিয়াছে, "নিজস্ব সংবাদাতার" এই মন্তব্য পড়িয়া যে মিঃ উপানন্দ হাজরা হতাশ হইবেন তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সংবাদপত্রের বিবরণে অরুণ চৌধুরীর প্রাণনাশের এই চেষ্টা যে মালিকের ষড়যন্ত্ররূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাতে তিনি যথেষ্ট আশ্বস্ত হইলেন। এই অপকার্য্যের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব তাহা হইলে স্যার মৃগাঙ্ক সান্যালের উপরেই পতিত হইয়াছে। এই ঘটনার সহিত মিঃ উপানন্দ হাজরার বিন্দুমাত্র যোগ থাকিতে পারে কি কাহার ও ব্যক্তিগত ঈর্ষা জড়িত থাকিতে পারে কি কাহারও ব্যক্তিগত ঈর্ষা-জড়িত থাকিতে পারে সংবাদ-পত্রের বিবরণে সে সম্বন্ধে দূরতম ইঙ্গিত পর্য্যন্ত নাই।

মিঃ উপানন্দ হাজরা ধূমায়িত চায়ের পেয়ালার সম্মুখে বসিয়া ভাবিতেছিলেন, সংবাদপত্রের মন্তব্যকে বলিষ্ঠ যুক্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি গোপনে সেদিনকার গুপ্ত বৈঠকে স্যার মৃগাঙ্ক সান্যালের উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া দিবেন। ধর্মঘটের উদ্যোক্তা ও সমর্থনকারীদের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত হিংসাত্মক কার্য্যের প্ররোচনা রহিয়াছে। ভাবী জামাতার বিরুদ্ধে শশুরের গোপন ষড়যন্ত্রের কথা সংবাদপত্রে প্রকাশ হইয়া পড়িলে শিল্পপতির নাম কলঙ্কিত হইবে—পিতাপুত্রীর মধ্যে চিরস্থায়ী বিদ্বেষের বীজ উপ্ত

হইবে। একভাবে-না-একভাবে উপানন্দ হাজরার অভিসন্ধি সফল হইবেই।

অপরদিকে স্যার মৃগাঙ্ক সান্যাল পূর্বরাত্রিতেই এই সংবাদ অবগত হইয়াছেন। এই আকস্মিক দুর্ঘটনার সংবাদে তিনি মর্মাহত হইয়াছেন। কিন্তু দুর্ঘটনার যে কোনরূপ অভিসন্ধিমূলক বাখ্যাত হইতে পারে ইহা তিনি কল্পনাও করেন নাই। সরকারী হাসপাতালে টেলিফোন করিয়া তিনিই অরুণের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন, অরুণের অবস্থা সম্বন্ধে ঘন ঘন টেলিফোনে সংবাদ লইয়াছেন।

শিল্পপতি মৃগাঙ্ক সান্যাল ঘরময় পায়চারী করিয়া অস্থিরচিত্তে বিনিদ্ররজনী অতিবাহিত করিয়াছেন। বারে বারে নিঃশব্দে দরজা খুলিয়া লুকাইয়া মনীষার শয়নকক্ষে হাজির হইয়াছেন। অরুণের কথা ভাবিতে গিয়া বারংবার কল্পনায় মনীষার ম্লান মুখচ্ছবি তাঁহার মনে জাগিয়াছে। অরুণের এই প্রাণশংসয়কর দুর্ঘটনার সংবাদ শুনিলে মনীষা যে কতখানি কাতর হইবে তাহা ভাবিয়া রাত্রির শীতল আবহাওয়াতেও শিল্পপতি ঘামিয়া উঠিয়াছেন। সম্প্রতি অরুণের সহিত তাঁহার মতভেদ তীব্র হইয়াছে, মাঝে মাঝে এই মতবিরোধ উভয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান পূর্বের ন্যায় অব্যাহতভাবেই চলিয়াছে।

ইহা ছাড়া আর একটা দিকও আছে। মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্কে তাহাদের মতের অনৈক্য মনীষারও অজ্ঞাত নহে। কাজেই অরুণের অপঘাতের সংবাদ শুনিবামাত্র

তাহার মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগিবে, বর্ত্তমান শ্রমিকবিরোধের সহিত এই দুর্ঘটনার কোন সম্পর্ক আছে কিনা। শিল্পপতি যতই ভাবিতেছেন ততই তাহার নিজেকে অপরাধী মনে হইতেছে। অরুণ নিহত হইলে ধর্মঘটের নৈতিক সমর্থন থাকিবে না, ধর্মঘধকারী শ্রমিকদের সংহতি ও প্রতিরোধ তাসের ঘরের ন্যায় ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

একমাত্র কন্যার সুখের সৌধকে তিনিই স্বহস্তে উৎপাটিত করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন। বাল্যাবধি একই বৃন্তে যে দুইটি কুসুম তাহারই স্নেহের পীযুষধারায় সঞ্জীবিত হইয়াছে আজ তিনি নিজেই ক্রূর সর্প হইয়া একটিকে দংশন করিতে চাহিয়াছিলেন—শিল্পপতি অনুতাপের আগুন দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগের পর পিতাকে বারান্দায় উপবিষ্ট দেখিয়া মনীষা বিস্মিত হইল। প্রত্যহ সে-ই উঠিয়া পিতাকে জাগাইত। খাড়া-খাড়া উষ্কখুস্ক চুল, দলিত মথিত অবসন্ন দেহ, কালি-পড়া বসিয়া যাওয়া চোখ, শুষ্ক-বিষন্ন মুখের দিকে চাহিয়া মনীষা সভয়ে প্রশ্ন করিল, "একি চেহারা হয়েছে তোমার!" ঘুমাতে পারোনি রাত্রে! দুশ্চিন্তায় প্রেসার বোধ হয় বেড়েছে? এযে হবে, সে আমি আগে থেকেই জানতেম। আমায় ডেকে তুললে না কেন বাবা?" ধীর পদ ক্ষেপে অগ্রসর হইয়া ঘর্মাক্ত-ললাটে শীতল করস্পর্শে পিতার দেহতাপ অনুভব করিল ও বস্ত্রাঞ্চলে উহা মুছাইয়া পুনরায় স্পর্শ করিয়া বলিল, তাপ অস্বাভাবিক বলেই মনে হয় বাবা।"

"আঃ কি ঠাণ্ডা হাতখানি তোমার মামনি! মুহূর্ত্তে আমি যে কি শান্তি পেলাম! এমনি করে এই বুড়ো ছেলের সব জ্বালা জুড়িয়ে দিতে পারিস মা?"

শিল্পপতি তাহার সুকোমল হাতখানি পুনরায় টানিয়া আনিয়া চক্ষুর উপর রাখিয়া নয়ন মুদ্রিত করিলেন। স্নেহসিক্তা মনীষা পরমযত্নে অপর হস্তখানি দিয়া বৃদ্ধপিতার শুভ্ররেশমের ন্যায় কেশের উপর ইতস্ততঃ হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিল।

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শিল্পপতি কহিলেন, "বড়োর অহঙ্কারে মত্ত হয়ে যে কত ভুল কত দোষ করি, পারবি মা আমার সব দোষ, সব অপরাধ ক্ষমা করতে?"

একটু থামিয়া তিনি পুনর্বার কহিলেন, "হ্যাঁরে, যে নিষাদ ক্রৌঞ্চিসহচরকে বিনাশ করেছিল, আদিকবি তাঁর কি শাস্তির ব্যবস্থা করেছিল বলতে পারিস মামনি?"

পিতার মুখে সহসা এই খেদোক্তি ও আত্মসমালোচনা শুনিয়া মনীষা বিস্ময়-বিমূঢ়চিত্তে ভাবিতে লাগিল, তাহার গম্ভীর আত্মসমাহিত পিতার এ পরিবর্ত্তন কেন।

সকন্যা শিল্পপতিকে চায়ের টেবিলে উপস্থিত দেখিয়া বৃদ্ধ খানসামা অসিয়া জানিতে চাহিল আজ সাহেবের প্রাতরাশ সে-ই প্রস্তুত করিয়া আনিবে কিনা। শুনিয়া মনীষা তৎক্ষণাৎ নিচে নামিয়া গিয়া পিতার জন্য স্বহস্তে চা ও খাবার প্রস্তুত করিতে লাগিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে মনীষা যখন চায়ের সরঞ্জাম হস্তে উপরে

উঠিয়া আসিল শিল্পপতি তখনও চেয়ারে হেলান দিয়া নিমীলিত চক্ষে তন্ময় হইয়া কি ভাবিতেছিল। টেবিলের উপর সত্যঃরক্ষিত দৈনিক সংবাদপত্রখানি সম্পূর্ণ অস্পৃষ্ট ও অপঠিত পড়িয়া আছে। দূর হইতে মনীষার দৃষ্টি স্বভাবতঃই সংবাদ পত্রের স্থূলকায় শিরনামাটির উপর পতিত হইল।

একটা ঝন্ ঝন্ শব্দে শিল্পপতির উদ্‌ভ্রান্ত তন্ময়তা কাটিয়া গেল। তিনি চমকাইয়া উঠিয়া দেখিলেন মনীষা মেঝের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার হস্তবাহিত খাদ্যোপকরণ ও সরঞ্জামগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।

পিতৃক্রোড়ে শায়িত মনীষার যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। প্রভাতসূর্য্য তখন দীর্ঘপথ পরিক্রমণ করিয়া মধ্যগগনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। শিল্পপতি কন্যাকে কোলের উপর শোয়াইয়া মৃদু ব্যাজন করিতেছিলেন। মনীষা ক্লান্ত আঁখি মেলিয়া কয়েক মিনিট তাহার স্নেহময় পিতার বেদনাক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, অস্পষ্টস্বরে প্রশ্ন করিল, "তিনি বেঁচে আছেন বাবা ?"

শিল্পপতি কন্যাকে আশ্বস্ত করিবার উদ্দেশ্যে অরুণের আঘাতটাকে লঘুভাবে বর্ণনা করিয়া কহিলেন, "হাঁা মা, বেঁচে আছে বৈ কি। অরুণ শীগগীরই ভাল হয়ে উঠবে। আমি তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছি।"

কয়েক মিনিট নিঃশব্দে কাটিবার পর মনীষা অবসন্নভাবে কহিল, "তিনি কোথায় বাবা ? আমায় সেখানে পাঠিয়ে দাও।"

"তুমি নিশ্চয়ই যাবে মা। তুমি না গেলে তার সেবা করবে কে !" একটু ভাবিয়া তিনি অনুতপ্তকণ্ঠে কহিলেন,

"অরুণ যদি আমাকে ভুল বুঝে থাকে, ভুল বোঝবার সুযোগ তো আমিই তাকে দিয়েছি।"

সজোরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস টানিয়া পুনরায় কহিলেন, "অরুণ আমার সব দর্প চূর্ণ করে দিয়েছে মা। আমি আমার ভূল বুঝতে পেরেছি। চলো মা আমিও তোমার সংগে যাই অরুণের কাছে ক্ষমা চেয়ে আসি। মনীষার অশ্রুসিক্ত মুখখানি এক অপূর্ব আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

ঐ দিনই মধ্যাহ্নে শিল্পপতি স্যার মৃগাঙ্ক সান্যাল ধর্মঘটকারী-শ্রমিকদের এক প্রতিনিধিদলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শ্রমিকদের উপস্থিত দাবীগুলি মানিয়া লইয়া অদূর ভবিষ্যতে শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদন্তের পর তাহাদের ন্যায়সঙ্গত অভাব-অভিযোগ দূরীকরণের প্রতিশ্রুতি দিলেন। শ্রমিক নেতাদের করতালির ধ্বনির মধ্যে শিল্পপতি ঘোষণা করিলেন, এখন হইতে কারখানা পরিচালনার সর্বময় কর্তৃত্ব তাহাদের প্রিয় ওয়ার্কস্-ম্যানেজার অরুণ চৌধুরীর উপর ন্যস্ত হইল। শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক নির্দ্ধারণ করিবেন তিনিই।

শিল্পপতি বলিলেন, তিনি আশা করেন অরুণের কর্তৃত্বে শ্রমিকেরা কারখানা পরিচালনার কার্য্যে উত্তোরত্তর অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিবে এবং দেশের শিল্পোন্নতির জন্য মালিক ও শ্রমিক পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিবে।

শ্রমিক-নেতৃবর্গ ও তাহাদের পশ্চাতে হাজার হাজার শ্রমিক স্যার মৃগাঙ্ক সান্যাল ও অরুণ চৌধুরীর জয়ধ্বনি করিতে করিতে বিদায় হইল।

অপরাহ্নে শিল্পপতি মনীষাকে লইয়া সরকারী হাসপাতালে অরুণের কেবিনে আসিয়া দেখিলেন পীতাম্বর চৌধুরী, দয়াময়ী ও মৃদুলা অরুণের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছে। সকালে জ্ঞান হওয়ার পরে অসহ্য যন্ত্রণায় আর্ত্তচীৎকার করিতে শুনিয়া ডাক্তার সেই যে মরফিয়া প্রয়োগ করিয়া গেছেন, তাহারই আবেশে অরুণ তখনও নির্জীবের মত পড়িয়াছিল। একবার জাগিয়া উঠিয়া অরুণ একে একে সকলের প্রতি স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় বিহ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আবার অবসন্নভাবে চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া রহিল। মনে হইল সে যেন কাহারও অনুসন্ধান করিয়া হতাশায় ম্রিয়মান হইয়াছে। আর একবার চক্ষু মেলিয়া তাকাইতেই মৃদুলা মনীষাকে কাছে টানিয়া আনিয়া কহিল, "এই যে ছ্যাখো দাদা মনীষাদি এসেছে, জ্যাঠামনি এসেছেন, আমরা সবাই এসেছি।"

মনীষা অরুণের পায়ের কাছটিতে বসিয়া নত হইয়া তাহার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। অরুণ আর একবার সকলের দিকে দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া ইঙ্গিতে মৃদুলাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রমা কোথায় রে, রমা আসে নি?"

শুনিয়া মৃগাঙ্ক সান্যাল পিতাম্বর চৌধুরীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইলেন। মৃদুলা কোন জবাব না দিয়া করুণভাবে একবার মনীষার দিকে তাকাইল। ক্ষোভ ও অভিমানে মনীষার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। ইচ্ছা হইল অরুণের পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া উচ্চরবে কাঁদিয়া উঠে। অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া মনীষা আরও নত হইয়া বসিয়া রহিল। কেবল

দয়াময়ী অরুণের মুখের উপর সাগ্রহে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিলেন, "রমাকে খুঁজছিস অরুণ? সে তো সেই সকালেই চলে গেছে। মেয়েটা সারারাত জেগে কাটিয়েছে। রমাকে ডেকে পাঠাব কি? কিছু বলবি তাকে?"

পরদিনই স্যার মৃগাঙ্ক সান্যাল নিজ দায়িত্বে অরুণকে হাসপাতাল হইতে মুক্ত করিয়া স্বগৃহে লইয়া আসিলেন।

॥ একুশ ॥

মিঃ উপানন্দ হাজরা ঘটনা প্রতিকূল বুঝিয়া আত্মরক্ষার উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। শিল্পপতি স্যার মৃগাঙ্ক সান্যাল তাহার গগনচুম্বী ঔদ্ধত্য লইয়া এত সহজে ধর্মঘটকারী শ্রমিকদের সহিত আপোষ-মীমাংসার হীনতা স্বীকার করিয়া লইবেন, মিঃ হাজরা ইহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু অরুণ এখন সর্বময় কর্তৃত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই পরিস্থিতিতে রাতারাতি ভোল পাল্টাইয়া বকধার্মিক সাজিয়া মিঃ উপানন্দ হাজরা একেবারে যেন মাটির মানুষ হইয়া গেলেন। তথাপি বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। কারখানার শ্রমিক-নেতৃবর্গ কর্তৃপক্ষের আচরণে সন্তুষ্ট হইয়া এখন নিজেরাই মিঃ অরুণ চৌধুরীকে হত্যার চেষ্টার অপরাধীকে বাহির করিয়া আদালতে অভিযুক্ত করিতে সঙ্কল্প করিল। উপানন্দ হাজরার যথোচিত সতর্কতা সত্ত্বেও রহিম সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করিয়া দিল। কিন্তু অরুণই এই তদন্ত রহিত করিয়া মিঃ উপানন্দ হাজরাকে অবসর লইতে

পরামর্শ দিল ও তাহার অবসর-জীবন যাপনের উপযোগী অর্থ দিয়া তাহাকে কোম্পানির কার্য্য হইতে সসম্মানে বিদায় দিল।

শিল্পপতি বুঝিলেন অরুণ ও মনীষার বিবাহে আর কালক্ষেপ করা উচিত নহে। অরুণের উপর তিনি কারখানার সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন, এইবার মনীষার ভারও অরুণের সুযোগ্য-স্কন্ধে ন্যস্ত করিতে পারিলেই তিনি পরমাত্মার চিন্তায় অতিবাহিত করিতে পারেন।

মনীষার সেবা-যত্নে অরুণ দ্রুত আরোগ্যলাভ করিতেছে সত্য কিন্তু তাহার মনে যেন একটুও স্ফূর্তি নাই। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া মনীষার সহিত তাহার বাক্যালাপও হয় না। অরুণের সান্নিধ্যে তাহার মন যেরূপ আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠিত এখন মনীষার সেরূপ কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় না। অরুণ ও মনীষা পরস্পরের নিকট হইতে ক্রমশঃ যেন দূরে সরিয়া যাইতেছে।

সেদিন সকালে মনোরমা দাওয়ায় বসিয়া কুটনো কুটিতেছিল। অরুণের দ্রুত আরোগ্যলাভের জন্য মনোরমা দক্ষিণেশ্বরে পূজা মানত করিয়াছিল। তাহার মাসতুতো বোন সুরমার বড় ছেলেটিকে লইয়া ভবতারিণীর মন্দিরে যাইবার জন্য রমা প্রস্তুত হইতেছে দেখিয়া মনোরমা বলিল, "বেশী দেরি করিসনে যেন রমা, রথান না খেয়ে তোর সঙ্গে গেল।"

রমা নিষ্ক্রান্ত হইবার অল্পক্ষণ বাদেই সদরের কড়া নড়িয়া উঠিল। মনোরমা কৌতূহলভরে দরজা খুলিয়া দেখিতে পাইল পরিপাটিবেশে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। বাহির হইতেই

মনোরমাকে নমস্কার করিয়া আগন্তুক কহিলেন, "আপনিই তো রমার মা ? আমি পীতাম্বর চৌধুরী। আমার ছেলে অরুণ। রমার সংগে তার পরিচয় আছে। আশা করি আপনিও তাকে চেনেন।"

মনোরমা অতি মৃদুস্বরে "হ্যা" বলিতে তিনি একগাল হাসিয়া কহিলেন, "জানি, আপনারা তাকে চিনবেন। অরুণের কাছে সবসময়েই আপনার ও রমার কথা শুনি। রমার আর একজন অনুরাগী বন্ধু মনীষা আমার মা-জননী, তার মুখে তো রমার প্রশংসা ছাড়া কথাই নেই। সত্যি রত্নগর্ভা আপনি। অরুণের মা বলে, রমাই তার ছেলেকে বাঁচিয়েছে। সত্যিই তো, রমা সেদিন যে সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে, বাংলাদেশের ক'টা মেয়ের সে সাহস আর উপস্থিত বুদ্ধি আছে। সেদিন থেকে ভাবছি একবার আপনার শ্রীচরণ দর্শন করে যাব", বলিতে বলিতে পীতাম্বর চৌধুরী সোজা দাওয়ায় উঠিয়া নিজেই একখানি আসন টানিয়া বসিলেন।

অতঃপর গভীর আত্মীয়তার সুরে বলিতে লাগিলেন, "আপনাকে আপনজন মনে করি বলেই আপনার কাছে কোন কথাই লুকোব না। আমার অরুণ আর মনীষার বিয়ে ওদের ছেলেবেলা থেকেই একরকম ঠিক হয়ে আছে। সান্যাল মশাইর ইচ্ছে যত শীঘ্র পারেন দুটিকে এক করে দেন। তারপর একটু কাশিয়া হাতের ছড়িগাছা নাড়িতে চাড়িতে কহিলেন, "ভগবানের ইচ্ছায় কোথাও তো কোন গোল নেই—তবে কিনা দেখছি এই আঘাতটা পাবার পর থেকে অরুণ

কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। রমা ওর জীবন দিয়েছে, রমার প্রতি অরুণের সমস্ত জীবন কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত। তাছাড়া রমার গুণে কে-ই বা না মুগ্ধ হয়েছে! সবই তো বুঝি, কিন্তু মনীষার কথাও তো না ভেবে পারিনে। সারাটা জীবন উমার ন্যায় তপস্যা করে আসছে। অরুণের সঙ্গে বিয়ে না হলে মনীষাকে বাঁচানো যাবে না," বলিয়া চিন্তিতভাবে চুপ করিয়া রহিলেন।

মনোরমার প্রথম হইতেই বিস্ময়ের অবধি ছিল না। ক্রমশঃ পীতাম্বর চৌধুরীর কথার ভঙ্গীতে বিস্ময়ের সহিত ভীতির সঞ্চার হইয়া তাহাকে যেন প্রস্তরে পরিণত করিয়া দিল। পীতাম্বর চৌধুরী পুনরায় গলা ঝাড়িয়া বলিতে লাগিলেন "কিন্তু রমাই এই বিপদ থেকে আমাদের বাঁচাতে পারে। কথা দিন সে আমাদের সবাইকে বাঁচাবে।"

মনোরমা গভীর বিস্ময়ে অর্ধস্ফুটস্বরে কহিল, "রমা"!

ব্যারিষ্টার পীতাম্বর চৌধুরী বলিলেন, "হ্যাঁ। কী করে তাও বলছি। রমা আর সব মেয়ের মত সামান্য নয়। ওর উপর ঈশ্বর অনেক বড় কাজের ভার দিয়েছেন। সাধারণ মেয়ের মত ঘর গেরস্থালী পেতে তৃপ্ত হবে এমন মেয়ে ও নয়। আর এদের দুজনকে মিলিয়ে দিতে রমাই পারে। আর স্যার মৃগাঙ্ক সান্যাল বলেছিলেন তার কলেজ থেকে একটা বিশেষ বৃত্তি দিয়ে তিনি রমাকে বিলেত পাঠাতে চান। বিলেত থেকে উচ্চশিক্ষা নিয়ে এসে রমা আমাদের মুখ উজ্জ্বল করবে। বলুন, এতে আপনার কোন আপত্তি নেই। ওরকম মেয়ের

গর্ভধারিণী আপনি, জানি এতে আপনি অমত করবেন না। আপনার যতটুকু পরিচয় পেয়েছি তাতে অপত্যস্নেহের চেয়ে দেশপ্রেম নিশ্চয়ই আপনার কাছে বড় জিনিষ।”

মনোরমার চক্ষু দুইটি কখন জলে ভরিয়া গিয়াছিল। নিজেকে সামলাইয়া লইয়া মনোরমা কহিল, “সে কথা থাক পীতাম্বরবাবু। রমা কিভাবে অরুণের সহিত মনীষার বিয়েতে বাধা হতে পারে আমি তা জানি না। তবু আপনাকে কথা দিচ্ছি মনীষা আমার মেয়ের মত, মনীষার সুখের জন্য রমাকে যদি দূরে সরে যেতে হয় আমি তাতে অমত করব না।” কথা কয়টি শেষ করিয়া মনোরমা ঝড়ের বেগে ভিতরে ঢুকিয়া গেল। চতুর ব্যারিষ্টার পীতাম্বব চৌধুরী কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া হৃষ্টমনে ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বাহির হইয়া গেলেন।

রমা যখন ফিরিল, তখন বেলা অনেকটা গড়াইয়াছে। ক্লান্ত দেহে ঘরে ঢুকিয়া দেখিল মা মুখ ঢাকিয়া শুইয়া আছে। কাছে বসিয়া মায়ের পায়ের উপর হাত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল “কী হয়েছে মা?” মনোরমা রমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলিল “তোকে হারাবার ভয়ে স্বামীর ভিটা ছেড়ে চলে এসেছিলাম। আবার বুঝি তোকে হারাতে হয় রে।” তারপর কিছুক্ষণ পুর্বের ঘটনা সবিস্তারে বিবৃত করিয়া মনোরমা শান্ত ও সংযতভাবে বলিল, “আমি তাকে কথা দিয়েছি রমা, মনীষার জন্য দরকার হলে তুই দেশ ছেড়ে দূরে চলে যাবি।”

মায়ের কথা শুনিয়া রমা যেন পাষাণ-প্রতিমা হইয়া গেল। ক্ষণকাল পরে রমা উঠিয়া তখনই বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

মনোরমা ব্যাকুল হইয়া কাতরভাবে ডাকিলেন "ওরে রমু, তোর যে খাওয়া হয়নি মা, লক্ষ্মীটি আমার দুটি খেয়ে যাবি

দুইমাস পরে সরকারী ডাক বিভাগের. শীলমোহরাঙ্কিত পরিচিত হস্তাক্ষরের একখানা চিঠি পাইয়া মনীষা গভীর বিস্ময়ের সহিত খুলিয়া পড়িল। রমা লিখিয়েছে—

ভাই মনীষা,

অনেকদিন তোর সঙ্গে দেখা হয়নি। খুব ইচ্ছা করছে একবার তোকে দেখি, কিন্তু আর তা হবার উপায় নেই। কাল ভোর ছ'টায় আমাদের জাহাজ 'যাত্রী' কলিকাতা বন্দর থেকে আন্দামানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। বিদায়, আমার জীবনের সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে উপকারী বন্ধু, বিদায়।

ভালোবাসার শরিক থাকতে নেই, নারে? সত্যি ভালো-বাসার মত হিংসুটে সংসারে বুঝি আর কিছু নেই। দুই বন্ধুর মধ্যে আর সব বিষয়ে যতই মিল থাক, এক বিষয়ে অমিল থাকাটাই বোধ করি ভালো। আমার দুর্ভাগ্য, অরুণ-বাবুকে আমরা দুজনেই ভালবেসেছিলাম। বিশ্বাস কর মনীষা, আমি তোর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাইনি। এজন্য দায়ী আমার অদৃষ্ট। অরুণবাবুর সংগে আমার সম্পর্ক কি ধরণের হওয়া উচিত এ নিয়ে আমার মনে কোনদিন ভুল ধারণা ছিল না। সব সময়েই আমি নিজেকে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছি। এ জন্যে সময় সময় তোর উপর নিষ্ঠুরতাও করতে হয়েছে, কিন্তু আমার অদৃষ্ট আমাকে এমন

কতগুলি ঘটনার মধ্যে নিয়ে ফেলেছিল যেখানে তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসা ছাড়া উপায় ছিল না। নিজের অজ্ঞাতেই কখন যে তাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম নিজেই টের পাইনি। প্রথম বুঝলাম সেদিন যেদিন শুনলাম আমাকে তার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে হবে। আর আমার মনটা তখন ব্যাথায় টনটন উঠলো, মনে হোলো অরুণবাবুকে ছাড়া আমার কাছে ও সংসার অর্থহীন।

তোর কাছে আমার ঋণের সীমা নেই, তোর কাছে রও আমার কিছু নেই। তাই যার ঋণ আমি প্রাণ দিয়ে শুধতে পারব না তার হাতে আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় যিনি তাঁকেই দিয়ে গেলাম।

তুই বোধ হয় জানিস না তোর বাবা অশেষ করুণা করে আমায় উচ্চশিক্ষার জন্যে বিদেশে পাঠাতে চেয়েছিলেন। নতমস্তকে তাঁর করুণা আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি। ওখানকার এক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিয়ে আমি আন্দামানে চলেছি।

সোনার বাংলার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, প্রার্থনা করিস যেন ওখানেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে পারি। ভাই, অনেক ঋণে আমায় ঋণী করেছিস। তবুও তোর উপরেই আমার অভাগিনী মায়ের ভার দিয়ে গেলাম। মাকে দেখিস। সান্ত্বনা নয়, মা ডাক শুনিয়ে তাকে শান্তি দিস।

পারিসতো এই হতভাগিনীকে ভুলে যাস মনীষা যে তোকে শুধু দুঃখই দিলে। আর অরুণবাবুকে সব সময়

ভুলিয়ে রাখিস যাতে আমার কথা তার মনে না পড়ে। তিনি যেন কোনদিন না জানতে পারেন আমি তাকে ভালবেসেছিলাম আজও ভালবাসি।

প্রার্থনা করি, সুখী হ' বোন পূর্ণ হ'।

—তোর রমা।

চোখের জলে মনীষার দুইচোখ ঝাপসা হইয়া আসিয়া রমার পত্রখানি ভিজাইয়া দিল। শানাইয়ের করুণ রাগিনীতে তখন ঘর ভরিয়া গেছে।

সমাপ্ত